ভূমিকা

আভিজাত্য বা শহীদের ডাক কাল্পনিক নাটক। বিশেষ যত্নে নাথ কোম্পানি যাত্রাপার্টির প্রয়োজনে এই নাটকখানি লিখিতে হয়। নাটকখানি যে অভূতপূর্ব্ব সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নাথ কোম্পানির শিল্পীগণ ও মঞ্চ, আসর ও পর্দার বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম.এ, মহাশয় নাটকখানিকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য যে আয়াস স্বীকার করেছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ইতি—

গ্রন্থকার।

—পুরুষ—

মুকুটসিংহ	...	...	পদ্মনগরের রাজা।
ভানুসিংহ	...	...	ঐ ভ্রাতা।
কানাইসিংহ	...	...	ঐ পুত্র।
ভবানন্দ পাল	...	...	হরিপুরের জমিদার।
অচিন্ত্য	...	...	ঐ পুত্র।
সিদ্ধেশ্বর	...	...	ঐ দেওয়ান।
কৈমুদ্দিন	.	...	দস্যুসর্দার।
আব্বাসউদ্দিন	...	...	ঐ পুত্র।
মাণিক পোদ্দার	...	...	স্বর্ণব্যবসায়ী।
মধুসূদন	...	...	ঐ পুত্র।
কৈলাস	...	...	দেশসেবক।

—স্ত্রী—

সৌদামিনী	...	...	পদ্মনগরের রাণী।
সাধনা	...	...	ঐ কন্যা।
মন্দাকিনী	...	...	ভবানন্দের স্ত্রী।
ভবানী	...	...	মাণিকের স্ত্রী।

—:০:—

আভিজাত্য

—:•(•)•:—

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য।

হরিপুর—জমিদার ভবন।

[নহবৎ বাজিতেছিল]

স্বর্ণকবচহস্তে উত্তেজিত ভবানন্দ ও মন্দাকিনীর প্রবেশ।

ভবানন্দ। না—না, আমি কোন ভুল করিনি। হরিপুরে দু'বছর অজন্মা বলেই প্রজাদের খাজনা মুকুব করে দিয়েছি। তবে আমার এই প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশনে যদি গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদে কিছু ব্যয় না করি, তাহলে নিজের কাছেই যে নিজে অপরাধী হব!

মন্দাকিনী। দেশের এই দুর্দিনে লাখটাকার উপর ব্যয় করে ছেলের অন্নপ্রাশন না দিলে যদি নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী হতে হয়, তাহলে ত দেখছি দশটা ছেলের অন্নপ্রাশনের খরচেই তোমায় দেউলে হতে হবে।

ভবানন্দ। একি একটা কথা হল মন্দাকিনী? ছেলের অন্নপ্রাশনের খরচে আমি দেউলে হব?

মন্দাকিনী। তা বাজী-বাজনা আর নিমন্ত্রণের যা ঘটা দেখছি,

তাতে দেউলে হতে আর কদিন? প্রজাদের উপর দয়া করে খাজনা মুকুব করে দিয়েছ, কিন্তু নূতন রাজা মুকুটসিংহ কি তোমার রাজকর ছেড়ে দেবে?

ভবানন্দ। তা দিলে রাজার চলে?

মন্দাকিনী। রাজার যদি না চলে, তোমার চলবে কি করে?

ভবানন্দ। চালাবার মালিক ভগবান; তাঁর উপর ভরসা রাখলে সব ঠিক হয়ে যাবে। যাক্, এই নাও সাতখানা হীরে দিয়ে এই সোনার কবচটা তৈরী করিয়ে এনেছি। অন্নপ্রাশনের সময় ছেলের হাতে পরিয়ে দিও।

মন্দাকিনী। সা—ত—খা—না হীরে দিয়ে বাঁধানো সোনার কবচ।

ভবানন্দ। হ্যাঁ। আমার প্রথম সন্তানকে যদি এই সামান্য উপহার না দিই, তাহলে লোকে বলবে কি?

মন্দাকিনী। বলবে আমার মাথা আর মুণ্ডু! অজন্মার দরুণ দু'বছর আদায় নেই। অথচ জমিদারের আদপ বজায় রাখতে তুমি দেনা করে সাতখানা হীরে দিয়ে সোনার কবচ তৈরী করিয়ে এনেছ ছেলের অন্নপ্রাশনের যৌতুক দিতে?

ভবানন্দ। হ্যাঁ। তুমি ধনীর মেয়ে হলেও তোমার বাবা বড় ব্যবসাদার, তাই জমিদারের আভিজাত্য তুমি বুঝবে না। যাও, আর কথা কাটাকাটি করো না। হীরে বাঁধানো কবচটা নিয়ে গিয়ে ছেলের হাতে পরিয়ে দাও, নিমন্ত্রিত মেয়েপুরুষরা এসে দেখুক।

মন্দাকিনী। নিমন্ত্রিত মেয়ে-পুরুষরা তোমার ছেলের হাতে হীরের কবচ দেখে তোমায় ধন্যবাদ দেবে না, বরং মুখ টিপে বিদ্রূপের অট্টহাসি হাসবে।

ভবানন্দ। কেন?

মন্দাকিনী। বলবে, দেশের প্রজারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে মরছে, আর দেশের জমিদার ছেলের হাতে হীরের কবচ পরিয়ে অন্ন-প্রাশনের ঘটা করছে।

নেপথ্যে কৈলাস গাহিল।

গীত।

হায় রে দেশের অভাগা দল।
তোদের পেটে নেই ভাত
পরনে টেনা কে ভাবিছে সে কথা বল।

ভবানন্দ। কে—কে আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে এই দুঃখের গান গেয়ে যাচ্ছে? আমার প্রথম সন্তানের শুভ অন্নপ্রাশনের দিনে এই কান্নার সুরে গান গেয়ে যায় কে?

মন্দাকিনী। কে আবার? কৈলাস। দেশের ভাই-বোনদের দুঃখ তার মত আর কে বোঝে বল?

ভবানন্দ। এই যে দুঃখ বোঝাচ্ছি! [নেপথ্যে চাহিয়া] কৈলাস, এই ব্যাটা কৈলাস, শুনে যা!

মন্দাকিনী। ওকে ডাকলে কেন? মারধোর করবে নাকি?

ভবানন্দ। না—না! মেঠাই-মোণ্ডা খাওয়াব।

গীতকণ্ঠে কৈলাসের প্রবেশ।

কৈলাস। গীত।

হায় রে দেশের অভাগা দল।
তোদের পেটে নেই ভাত,
পরনে টেনা কে ভাবিছে সে কথা বল।

ভবানন্দ। খবরদার! আমার ছেলের শুভ অন্নপ্রাশনের দিনে দুঃখের গান গেয়ে অকল্যাণ করিস নি।

কৈলাস। **পূর্ব্বগীতাংশ :**

অন্নপূর্ণা নিদয়া আজ,
তাই শিরেতে পড়ছে বাজ,
হায় বিধাতা এদের নেইক লাজ আমোদ-প্রমোদ তেমনি সচল।

ভবানন্দ। কি, এতবড় স্পর্দ্ধা? আমার ছেলের অন্নপ্রাশনের আমোদ-প্রমোদ চলছে বলে আমরা হলুম লজ্জাহীন? কে আছিস? আমার চাবুক নিয়ে আয়, চাবকে ওর পিঠের ছাল তুলে নেবো।

কৈলাস। পিঠের ছাল তুলে নিলেই কি প্রজাদের মুখে আগল দিতে পারবেন হুজুর? দেশের এই দুর্ভিক্ষে আপনি একটা কাণা-কড়িও ব্যয় করেন নি, অথচ ছেলের ভাতে লাখ টাকা খরচ করে বাজি-বাজনার ঘটা করছেন।

ভবানন্দ। এতেই বুঝি তোদের চোখ টাটিয়ে যাচ্ছে ছোটলোক ব্যাটারা? আর আমি যে দু'বছরের খাজনা মুকুব করে দিয়েছি—সেটা বুঝি আমার দান নয়?

কৈলাস। তার জন্যে প্রজারা ত দিনরাত আপনার জয়গান করছে বাবু! কিন্তু যে দেশে দুর্ভিক্ষ, সে দেশের জমিদার বাড়ীতে যদি আনন্দ-উৎসব হয়, তাহলে ভিন্‌দেশের লোকেরা বলবে কি বাবু?

ভবানন্দ। ভিন্‌দেশের লোকেরা কিছু বলবে না, বলা-কওয়া যা কিছু সব আমার প্রজাদের।

কৈলাস। প্রজারা অন্যায় বলে না হুঁজুর! কচুর ডাঁটা সেদ্ধ

আর ফ্যান খেয়ে হা-পিত্যেস করে যাদের আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, তাদের যে কত দুঃখ তা আপনি বুঝবেন না বাবু!

ভবানন্দ। বৃষ্টি না হলে আমি কি করব? ভগবানের উপর ত আর আমার হাত নেই।

কৈলাস। কিন্তু হুঁজুর! লাখ টাকা খরচ করে ছেলের অন্ন-প্রাশনে বাজি-বাজনায় ঘটা না করে যদি একটা খাল কাটিয়ে দিতেন, কিংবা একটা নলকূপ বসিয়ে দিতেন, তাহলে বৃষ্টির জল ছাড়াও চাষ আবাদ হত।

ভবানন্দ। বটে! একবার খাজনা ছেড়ে দেব, তার উপর লাখ টাকা খরচ করে খাল কাটিয়ে দেব, নলকূপ বসিয়ে দেব আমার প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশন বন্ধ করে?

কৈলাস। অন্নপ্রাশন একশো টাকা খরচ করেও ত হতে পারত হুঁজুর! কিন্তু প্রজাদের মুখের দিকে না চেয়ে এই লাখ টাকার আমোদ আহ্লাদে আপনাকে নিন্দেই কিনতে হবে বাবু।

ভবানন্দ। যারা নিন্দে করবে, আমি তাদের কঠোর হস্তে দমন করব।

কৈলাস। তাহলে ভগবানের চাবুকও আপনার পিঠে পড়বে হুজুর!

ভবানন্দ। কি বল্লি ব্যাটা ছোটলোক? [লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলেন]

মন্দাকিনী। কি করছ? কি করছ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

ভবানন্দ। সরে যাও—সরে যাও মন্দাকিনি! ওই ছোটলোক ব্যাটাকে শাসন না করলে—সমস্ত চাষীরাই আমার মাথায় উঠবে।

কৈলাস। **গীত।**

অহংকারে পূর্ণ ভরা ডুববে তরী মাঝ দরিয়ায়।
তুমি কূল পাবে না কোনদিকে শুধু চোখের জলই সার হবে হায়।
মারলে লাথি আমার বুকে,
থাকবে তুমি কতই সুখে,
তোমার পাপের বিচার হবে ভগবানের বিচারশালায়।

[প্রস্থান।

মন্দাকিনী। কি করলে—কি করলে? আজকের এই শুভদিনে প্রজার বুকে লাথি মেরে অভিশাপ কুড়িয়ে নিলে?

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবু—সর্ব্বনাশ হয়েছে। রাজকরের দায়ে রাজা মুকুটসিংহ আপনার হরিপুর জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন।

ভবানন্দ। এঁ্যা!

মন্দাকিনী। কৈলাসের অভিশাপ হাতে হাতে ফলে গেছে স্বামি! একটা দিনও বাদ গেল না।

ভবানন্দ। বাজে কথা বলো না মন্দাকিনী, চুপ কর! কি হল দেওয়ান, রাজা মুকুটসিংহ ত আমায় এক বছর সময় দিয়েছিলেন?

সিদ্ধেশ্বর। তরল মস্তিষ্ক যুবক, তার কথার মূল্য কি বাবু? আগে এক বৎসর সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তার হাতে অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া মাত্রই হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন

আজ সন্ধ্যার মধ্যেই রাজকরের টাকা আমানৎ করতে না পারলে, হরিপুর জমিদারী বাজেয়াপ্ত হবে।

মন্দাকিনী। এখন বুঝতে পারছো স্বামী, ছেলের অন্নপ্রাশনে ঘটা করে তুমি কত বড় ভুল করেছো?

সিদ্ধেশ্বর। আমিও তাই বলছিলাম বাবু, খোকার অন্নপ্রাশনে হৈ-চৈ না করাই ভাল।

ভবানন্দ। ভুল বুঝেছেন দেওয়ান মশাই! হরিপুর জমিদার বংশে এ আজ নতুন নয়। আমার বাপ-ঠাকুরদ্দার আমলেও রাজকর বাকি পড়ত, কিন্তু তারা কি পুজোপার্ব্বনে বা অন্নপ্রাশনে ঘটা করতো না?

সিদ্ধেশ্বর। সে কাল আর একালে অনেক তফাৎ বাবু। সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই। তাঁদের আমোলে ত আর মুকুটসিংহের মত রাজা ছিলেন না।

ভবানন্দ। সে আমোলে তাঁরা রামরাজত্বে বাস করে গেছে। না—না, মুকুটসিংহের অধীনে থেকে আর জমিদারী চালানো যাবে না।

সিদ্ধেশ্বর। তাহলে কি উপায় হবে বাবু?

ভবানন্দ। কি আর হবে? খোকার অন্নপ্রাশন হয়ে গেলে, সন্ধ্যার পর আমরা হরিপুর ছেড়ে চলে যাব।

মন্দাকিনী। সেকি! রাজকরের টাকা আমার গায়ের জড়োয়া গয়না বিক্রী করেও মিটবে না?

ভবানন্দ। তা হয়ত মিটবে। কিন্তু তোমার বাবার দেওয়া গহনা ত আমি নিতে পারব না মন্দাকিনী।

মন্দাকিনী। খোকার অন্নপ্রাশনের এই হীরের কবচ?

ভবানন্দ। তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে মন্দাকিনী! প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশনে যে হীরের কবচ তৈরী করিয়ে এনেছি, তা আজই বেচে দিয়ে আমি জমিদারী রক্ষা করতে চাই না। মুকুটসিংহের মত খেয়ালী রাজার অধীনে থেকে আর জমিদারী চালানো যাবে না; তার চেয়ে চলে যাওয়াই ভাল।

মন্দাকিনী। কোথায় যাবে?

ভবানন্দ। ভাগ্য যে দিকে নিয়ে যায়।

সিদ্ধেশ্বর। এত কাজের কথা নয় বাবু! আমার অনুরোধ, মা-লক্ষীর গহনা আর হীরের কবচ বিক্রী করে—

ভবানন্দ। মুকুটসিংহের দাবী মিটিয়ে জমিদারী রক্ষা করবো? আমার দৃঢ় পণ দেওয়ান মশাই! যে রাজার কথার মূল্য নেই, তার অধীনে থেকে আর জমিদারী চালাবো না।

সিদ্ধেশ্বর। বাবু!

মন্দাকিনী। আর অনুরোধ করবেন না দেওয়ান! জানেন ত, না বললে গুরুদেবও ওকে 'হাঁ' বলাতে পারেন না। এত হবেই! শত শত মানুষের মনস্তাপ, নিরীহ প্রজার বুকে লাথি মেরে অভিশাপ কুড়নো, একি কখনও ব্যর্থ হয়?

ভবানন্দ। সেই পাপেই যদি আমার জমিদারী চলে যায়, তাহলে জেনো মন্দাকিনী, রাজা মুকুটসিংহের রাজত্বও আর থাকবে না। যাক, চল অন্নপ্রাশনের কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ি।

সিদ্ধেশ্বর। আমি কোথায় যাবো বাবু?

ভবানন্দ। পারেন মুকুটসিংহের দেওয়ানী করুন, না পারেন দেশে চলে যান!

[মন্দাকিনীসহ প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। দেশে চলে যাব? না—না দেশে ফিরে যাব না। ভগবান—ভগবান? তোমার করুণায় যেন আমার নিমকের মর্য্যাদা রাখতে ওই নিষ্ঠুর রাজাকে কঠিন আঘাত দিতে পারি।

[প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পদ্মনগর রাজপ্রাসাদের বাহির মহল।

মুকুটসিংহ ও ভানুসিংহের প্রবেশ।

মুকুটসিংহ। বিচার—বিচার! এ আমার নিক্তির ওজনে বিচার! পুরাতন নীতির সমাধি দিয়ে নব নীতির প্রবর্ত্তন করতে আমি দৃঢ়হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করেছি। আমার বিচারের যূপকাষ্ঠে দেশ-বাসীর বিলাসিতার নেশা বলিদান দিয়ে আবার আমি সকলকে কর্ম্মঠ গড়ে তুলবো।

ভানুসিংহ। আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে দাদা! দেশবাসী আজ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। একজনের পরিশ্রমে আর একজনের পেট ভরানো যে অন্যায়, তা বিচার করার মত জ্ঞান তাদের এসেছে। অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করা যে মানবতার অপরাধ তা আজ সকলেই বুঝতে পারছে।

মুকুটসিংহ। ভুল—ভুল ভানু! এ তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা! সকলেরই যদি সে বিচার শক্তি থাকত—তাহলে হরিপুরের জমিদার

ভবানন্দ পাল চার বছরের রাজকর বাকি ফেলে ছেলের অন্নপ্রাশনে বাজী-বাজনায় লাখ টাকা খরচ করতো না।

ভানুসিংহ। এটা তার খুবই অন্যায়। কিন্তু ভবানন্দ পাল ত শোষক জমিদার ছিল না দাদা! অজন্মার বছর বলে প্রজাদের দু'বছরের খাজনাও তিনি মুকুব করে দিয়েছেন।

মুকুটসিংহ। এটা তার দয়া নয় ভানু! নাম কেনবার কৌশল। দেশে আবহাওয়া বদলে গেলেও ভবানন্দ এখনো পুরাণো নীতিই আঁকড়ে আছে। আভিজাত্যের গর্ব্বে ওরা মরবে, তবু মর্য্যাদা হারাবে না।

ভানুসিংহ। সত্যি দাদা! লোকটা জমিদারী ছেড়ে চলে গেল, তবু খাজনা দিলে না।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। খাজনা দিলে আপনাদের অন্যায় আচরণের পোষকতা করা হবে বলেই আমার মনিব জমিদারী ছেড়ে চলে গেলেন ছোটরাজা!

মুকুটসিংহ। ও, তাই বুঝি? কিন্তু এইবার যে তার গাছতলাই সার হবে।

সিদ্ধেশ্বর। তিনি বলেছেন, যে রাজার মতের ঠিক নেই, তাঁর অধীনে জমিদারী চালানোর চেয়ে গাছতলা অনেক ভাল।

মুকুটসিংহ। বটে! আচ্ছা, গাছতলা কত যে ভাল তা বুঝিয়ে দেবো। তুমি কি মনে করে সিদ্ধেশ্বর!

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞে জানেন ত, সব কাজের সিদ্ধিতেই সিদ্ধেশ্বরের প্রয়োজন! হরিপুরের জমিদার বংশের কাজকর্ম্মে এতদিন সিদ্ধি

দিয়ে এসেছি, এবার মহারাজের কাছে প্রার্থনা, যদি অনুগ্রহ করে—

মুকুটসিংহ। তোমাকে সিদ্ধিদাতারূপে বাহাল করি।

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞে, সেটা মহামান্য রাজাবাহাদুরের দয়া।

মুকুটসিংহ। দয়া! হাঃ-হাঃ-হাঃ! দয়া-মায়া আমার নেই সিদ্ধেশ্বর। কাজের লোকই আমার প্রিয়। তুমি কাজের মানুষ বলেই তোমাকে রাখতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু—

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু কি বাবু?

মুকুটসিংহ। পরীক্ষা দিতে হবে।

সিদ্ধেশ্বর। কিসের পরীক্ষা?

মুকুটসিংহ। মনে-প্রাণে এখনো তুমি ভূতপূর্ব্ব জমিদার ভবানন্দ পালের হিতৈষী কিনা, তার পরীক্ষা।

সিদ্ধেশ্বর। হুকুম করুন।

মুকুটসিংহ। আমার ভাই ভানুসিংহের সঙ্গে তোমায় যেতে হবে। ও যা করবে, সে কাজে যদি বাধা না দাও, তাহলে আমি তোমায় বিশ্বাস করে আমার কাজে বাহাল করবো।

সিদ্ধেশ্বর। আমি প্রস্তুত মহারাজ!

মুকুটসিংহ। উত্তম! যাও, আপাততঃ আমার সৈন্যাবাসে বিশ্রাম করগে।

সিদ্ধেশ্বর। যথাদেশ।

[অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।

মুকুটসিংহ। [তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] লোকটা সরল নয় তাই, চোখে ওর তীক্ষবুদ্ধির দীপ্তি। কিন্তু ওকেই আমি চাই! হাঁ, ভানুসিংহ! তোমার অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে এখুনি প্রস্তুত হও।

ভানুসিংহ। আদেশ করুন দাদা!

মুকুটসিংহ। ভবানন্দ পাল পুত্র-পরিবার নিয়ে গোঁসাই নগরের পথে পাল্কী চড়ে যাচ্ছে, তুমি সৈন্য নিয়ে ওদের গতিরোধ কর।

ভানুসিংহ। [চমকিত হইয়া] দাদা!

মুকুটসিংহ। আর শোন! ভবানন্দের কাছে বহুমূল্য হীরে জহরৎ আছে, পাল্কী আটক করে সেই সব অলঙ্কার কেড়ে নেবে।

ভানুসিংহ। সে যে দস্যুবৃত্তি দাদা!

মুকুটসিংহ। না—না, এ আভিজাত্য গর্ব্বি ভবানন্দের শাস্তি।

ভানুসিংহ। তার জমিদারী ত বাজেয়াপ্ত করেছেন!

মুকুটসিংহ। এইবার তার শেষ সম্বলটাও কেড়ে নিয়ে পথের ভিখারী করে দেবো। সে যে বলেছে, আমাদের অধীনে জমিদারী চালানোর চেয়ে গাছতলা অনেক ভাল, দেখবো এ জেদ তার বজায় থাকে কেমন করে।

ভানুসিংহ। কিন্তু—

মুকুটসিংহ। 'কিন্তু' বলে কাপুরুষ। বীরপুরুষ কখনো পেছন ফিরে তাকায় না, কাজের নেশায় সামনে ছুটে যায়। যাও, এই মুহূর্ত্তে সসৈন্যে গোঁসাই নগরের পথে ছুটে যাও, আর সঙ্গে নিয়ে যাও ওই সিদ্ধেশ্বরকে!

ভানুসিংহ। সেকি দাদা, ভবানন্দ পাল যে ওরই ভূতপূর্ব্ব প্রভু।

মুকুটসিংহ। সেইজন্যই ত ওকে সঙ্গে নিতে বলছি ভানু। ওর সামনে পাল্কী আটক করে গহনাগাটি কেড়ে নেবে। যদি প্রতিবাদ না করে তাহলে সঙ্গে নিয়ে আসবে। আর যদি একটি প্রতিবাদ বাক্যও উচ্চারণ করে তাহলে ওর মাথাটাই কেটে নিয়ে আসবে।

ভানুসিংহ। এ যে চরম নিষ্ঠুরতা দাদা।

মুকুটসিংহ। না—না, এ রাজনীতি। অন্ধকারে হীরের যাচাই। বিশ্বাসঘাতক শয়তানকে বাঁচিয়ে রাখলে পরিণামে ঠকে যেতে হয়। যাও, দেরী করো না, আমার নবনীতির প্রবর্ত্তনে এখুনি সসৈন্যে প্রস্তুত হও।

ভানুসিংহ। তাই হোক দাদা! আপনার নবনীতির প্রবর্ত্তনে আমি সাজবো হৃদয়হীন জল্লাদ; যদি ভগবানের চরণে কোন অপরাধ হয়, তাহলে সে অপরাধ আমার নয় দাদা, আপনার—আপনার।

[প্রস্থান।

মুকুটসিংহ। ধর্ম্মের নামে শপথ করে যেদিন রাজদণ্ড ধারণ করেছি, সেইদিন বুঝেছি সকলের সব পাপ—সব অপরাধের দায়িত্ব আমার। আমি শাসক—দেশের শান্তিরক্ষক। দেশকে গড়তে যদি প্রয়োজন হয় নররক্তের প্লাবন বইয়ে দেবো, রাজধানীর বুকে সৃষ্টি করবো বিশ্বাসঘাতক শয়তানদের ছিন্নমুণ্ডের মিনার। হাঃ-হাঃ-হাঃ

[প্রস্থান।

—:o:—

তৃতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

[একটি ব্যাধ যুবক ও একটি ব্যাধ যুবতি শিকার সন্ধানি নৃত্য করিয়া চলিয়া গেল। একটি পেটিকা বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে অগ্রে ভবানন্দ ও পশ্চাতে ভানুসিংহের প্রবেশ।]

ভানুসিংহ। দাও, গহনার পেটিকা আমার হাতে দাও!

ভবানন্দ। না—না, দেবো না! প্রাণ থাকতে গহনার পেটিকা দেবো না। এযে আমাদের শেষ সম্বল।

ভানুসিংহ। শেষ সম্বল তোমার কাছে রাখবো না। দাও শীগ্‌গির দাও! নইলে—

ভবানন্দ। আমাকে হত্যা করে গহনার পেটিকা কেড়ে নিয়ে যাবে।

ভানুসিংহ। দরকার হলে তাই করবো।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। মহারাজের ত সে হুকুম নেই ছোটরাজা।

ভবানন্দ। বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান, বুঝেছি কার চক্রান্তে আজ আমার জমিদারী রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত।

সিদ্ধেশ্বর। কিছুই বোঝেননি বাবু! ধর্ম্মের শপথ—

ভবানন্দ। চুপ কর বেইমান! ও পাপমুখে আর ধর্ম্মের নাম উচ্চারণ করো না শয়তান। আমার জমিদারী আত্মসাৎ করবার লোভেই মুকুটসিংহকে দিয়ে আমায় উচ্ছেদ করিয়েছো, এইবার

ছোটরাজাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ আমার শেষ সম্বল এই বহুমূল্য হীরের গহনাগুলো লুট করতে।

সিদ্ধেশ্বর। বাবু!

ভবানন্দ। চুপ! আর আমি তোমার মনিব নই নেমকহারাম। তোমার মনিব এখন এই ডাকাত রাজারা। চক্ষুলজ্জার খাতিরে বাবু বলে ডেকে কি নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারবে? যেমন নরাধম তুমি, তেমনি শয়তান তোমার নূতন মনিব। তুমি কেউটে সাপ, আর ওরা দুষ্ট শেয়াল।

ভানুসিংহ। মুখ সামলে কথা বল ভবানন্দ পাল! আমরা পুরুষ সিংহ। কৌশলে তোমার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করবার প্রবৃত্তি কোনদিন আমাদের ছিল না, আর আজও নেই। তুমি চার বছরের রাজকর না দিয়ে লাখ টাকা খরচ করে ছেলের অন্নপ্রাশন দিয়েছ, সেই রাগেই আমার দাদা তোমায় জমিদারী থেকে উচ্ছেদ করেছেন। সিদ্ধেশ্বরকে অকারণ তিরস্কার করছো। এর জন্য অপরাধী ও নয়— অপরাধ তোমার।

ভবানন্দ। চোরের সাক্ষী মাতাল আর শয়তানের জুড়িদার শয়তান! সিদ্ধেশ্বরের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য এ কথা ত বলবেই।

ভানুসিংহ। এত বড় অপমান? কি বলবো, তোমাকে হত্যা করবার হুকুম নিয়ে আসিনি, তাই মাথা নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছ। নইলে—

ভবানন্দ। মাথাটা কেটে শয়তান রাজা মুকুটসিংহকে উপহার দিতে। তাই নাও—তাই নাও নারকি! আমার রক্তে স্নান করে তোমাদের পৈশাচিক বৃত্তি চরিতার্থ কর। এস এস, এগিয়ে এস।

শিশুপুত্র ক্রোড়ে আলুলায়িতা কুন্তলা
বিন্যস্ত বসনা মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দাকিনী। না—না, আমার স্বামীকে মেরো না। দোহাই তোমার, আমার স্বামীকে মেরো না। আমাদের সর্ব্বস্ব নাও, শুধু আমার স্বামীর প্রাণটুকু ভিক্ষা দাও!

সিদ্ধেশ্বর। মা—মা, আপনি এখান থেকে চলে যান।

মন্দাকিনী। কেন দেওয়ান? আমার সামনে প্রভুকে হত্যা করতে লজ্জা হচ্ছে?

ভানুসিংহ। হত্যা করবার জন্য আমি তোমাদের পাল্কী আটক করিনি মা। আমার প্রয়োজন ওই হীরে জহরতের গহনাগুলো, তোমার স্বামীকে বিনা প্ররোচনায় দিয়ে দিতে বল, আমরা এখুনি চলে যাব।

মন্দাকিনী। দিয়ে দাও—দিয়ে দাও স্বামী! জমিদারী যখন চলে গেছে—তখন ওই পাপের ভার বয়ে আর কি হবে?

সিদ্ধেশ্বর। ব'য়েও ত নিয়ে যেতে পারবেন না। যতক্ষণ ওগুলো আপনাদের কাছে থাকবে—ততক্ষণ আপনারা নিরাপদ হতে পারবেন না। ছোটরাজা ছেড়ে দিলেও চোর-ডাকাতেরা ছাড়বে না।

ভবানন্দ। নাই ছাড়ুক! আমি বুকে ধরে চোর ডাকাতদের হাতে তুলে দেবো, তবু ওদের হাতে দেবো না।

ভানুসিংহ। জিতে হবে ভবানন্দ পাল। ভাল কথায় না দাও, তোমাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ওই গহনার পেটিকা কেড়ে নিয়ে যাব।

মন্দাকিনী। দরকার হবে না ছোটরাজা! আমরা এখুনি দিয়ে দিচ্ছি।

ভবানন্দ। মন্দাকিনি!

মন্দাকিনী। কেড়ে যখন নেবে, তখন আর অপমান সওয়ার প্রয়োজন কি স্বামী? ওই পাপ হীরে জহরতের গয়নাগুলো দিয়ে দাও।

ভবানন্দ। এগুলো যে আমাদের শেষ সম্বল মন্দাকিনী!

মন্দাকিনী। যে গহনা জীবন বিপন্ন করে, সেগুলো পথের সম্বল নয় প্রভু,—পথের কণ্টক। দিয়ে দাও ওই পাপ গহনা।

ভবানন্দ। কোন্ প্রাণে এ গহনাগুলো ওদের হাতে তুলে দেবো মন্দাকিনী? এযে আমাদের বিবাহে তোমার বাবার দেওয়া যৌতুক।

মন্দাকিনী। আমার কাছে ওর কোন মূল্য নেই প্রভু! মাথায় আছে বাবার আশীর্ব্বাদ, সিঁথিতে আছে তোমার দেওয়া রাঙা টক্‌টকে সিঁদুর, বুকে আছে ভগবানের দান এই সন্তান! কিছুই অভাব নেই আমার, গাছতলায় থাকলেও আমি শান্তিতে থাকতে পারবো।

সিদ্ধেশ্বর। আর আপত্তি করবেন না বাবু। দিয়ে দিন গহনার পেটিকা। এতে আপনিও বাঁচবেন, আর—

ভবানন্দ। তোমার নূতন প্রভুরাও লাখ লাখ টাকার জড়োয়া গহনার মালিক হবে। নাও—নাও বেইমান! তুমি নিজের হাতে গহনার পেটিকা নিয়ে প্রভুর ঋণ পরিশোধ কর—নূতন প্রভুর পায়ে উপঢৌকন দিয়ে। [সিদ্ধেশ্বরের হাতে গহনার পেটিকা দিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ! দেখ—দেখ ছোটরাজা! আমার দেওয়া এঁটো রুটি

খেয়ে যে কুকুর একদিন আমার পায়ে মাথা ঠুকেছে, সুযোগ বুঝে সেই আজ আমাকে দংশন করতে চায়।

সিদ্ধেশ্বর। এঁটো রুটি খেয়ে যাদের জীবন ধারণ করতে হয়, তারা রক্ষা করে শুধু চাকরির মর্য্যাদা। আভিজাত্য গর্ব্বে আপনি মানুষের মধ্যে দেবতার বিকাশ দেখতে পেলেন না, তাই আজ পথে দাঁড়িয়েছেন। যেদিন আভিজাত্যের গর্ব্ব পথের ধুলোয় মিশে গিয়ে আপনার চোখে দেবতার মূর্ত্তি ভেসে উঠবে, সেইদিনই বুঝতে পারবেন, দেওয়ান সিদ্ধেশ্বর রায় বেইমান নয়—বেইমান নয়।

[প্রস্থান।

ভানুসিংহ। আগুনে পুড়েই সোনা খাঁটি হয় ভবানন্দ পাল, লোহা থেকেই হয় কঠিন ইস্পাতের সৃষ্টি। মানুষকে মানুষ হতে হলে দারিদ্র্যের মধ্যেই জীবনের জয়গান করতে হয়।

[প্রস্থান।

ভবানন্দ। মানুষ হতে হলে দারিদ্র্যের মাঝে জীবন যাপনের উপদেশ সবাই দেয়, কিন্তু দারিদ্র্যের করালমূর্ত্তি দেখে উপদেশ দাতাও আতঙ্কে পালিয়ে যায়।

মন্দাকিনী। আমরা পালিয়ে যাব না প্রভু! এতদিন ধনজনপূর্ণ হয়ে প্রাসাদে বাস করেছি, আজ দারিদ্র্যকে ভগবানের আশীর্বাদ রূপেই বরণ করে নেবো।

ভবানন্দ। আর আমার কোন চিন্তা নেই মন্দাকিনী। ধনীর দুলালী তুমি, তুমি যদি হাসিমুখে দারিদ্র্যকে বরণ করতে পার, আমি কেন পারবো না তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে? চল, এবার আমরা নূতন করে জীবন সুরু করবো।

মন্দাকিনী। গহনার পেটিকা নিয়ে গেলেও খোকার হাতে

বাঁধানো কবচের ওপর দৃষ্টি পড়েনি। এই কবচ বেচেও কিছুদিন চলে যাবে। এর মধ্যে তুমি একটা রোজগারের পথ খুঁজে নিতে পারবে না?

ভবানন্দ। হ্যাঁ—হ্যাঁ! কবচের কথা ত মনে ছিল না। তাহলে দেখছি ভগবান একেবারে নির্দয় নন্? কিন্তু যাব কোথায়? পাল্কী ফেলে বাহকেরা ত পালিয়েছে।

মন্দাকিনী। কোথায় যাবে? আশ-পাশে নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে।

ভবানন্দ। খোকাকে নিয়ে তুমি এখানে অপেক্ষা কর মন্দাকিনী। আমি আশ-পাশে খুঁজে দেখি, যদি দেখা পাই ভাল, আর যদি না পাই নিকটস্থ কোন গ্রামে আশ্রয় নেবো।

মন্দাকিনী। তাই যাও, দেরী করো না যেন। [ভবানন্দের প্রস্থান] ভগবান! ভগবান! বিপদে ফেলে পরীক্ষা করছো প্রভু, কিন্তু দয়াল আমার স্বামী-পুত্রের যেন অমঙ্গল করো না। [মাটিতে বসিল]

টলিতে টলিতে আব্বাসউদ্দিনের প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। বাপজানের হুকুমে মধু আগরওয়ালার বাড়ীর অন্ধি-সন্ধি জানতে গেলুম, কিন্তু কাজ কিছু করতে পারলুম না, শালা ভাবনা গুঁড়ির কারসাজিতে। শালা রোজ মদ দেয়, কিন্তু আজ নিশ্চয়ই ধুঁতরোবিচি বেটে মদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। নইলে এত নেশা জমলো কি করে? পা ঠিক রাখতে পারছি না, এখন বাপজানের সামনে যাই কি করে, আর জিজ্ঞেস করলে মধু আগরওয়ালার খবরই বা কি বলব?

মন্দাকিনী। কে—কে কথা বললে? [ফিরিয়া] একি, কে—কে তুমি?

আব্বাসউদ্দিন। আমি,—আরে বা—বা, এ যে খাপসুরৎ জেনানা! ইয়া আল্লা, জবর শিকার মিলেছে।

মন্দাকিনী। [সভয়ে] কি বলছো তুমি? তোমার উদ্দেশ্য কি?

আব্বাসউদ্দিন। উদ্দেশ্য মহৎ। বাচ্চাটাকে ফেলে দিয়ে চলে এস পিয়ারী, আমার গলা জড়িয়ে চলে এস আমাদের ডেরায়, তোমাকে আমি বহুৎ সুখে রাখ্‌বো।

মন্দাকিনী। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, ওকথা শোনাও আমার মহাপাপ! এখান থেকে চলে যাও। নইলে এখুনি আমার স্বামী ফিরে এসে তোমায় কঠোর শাস্তি দেবে।

আব্বাসউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শাস্তি? ফুঃ! এদেশে ডাকাত বৈমুদ্দিনের বাচ্চা আব্বাসউদ্দিনকে শাস্তি দেবার মত জোয়ান মরদ আছে নাকি সুন্দরি? কেন দিগ্‌দারী করছো পিয়ারী? পুঁচকে বাচ্চাটাকে ফেলে দিয়ে আমার হাত ধরে চলে এস, তোমাকে নিকে করে আমি বহুৎ সোনার গহনা যৌতুক দেবো।

মন্দাকিনী। গহনার লোভ কি দেখাচ্ছিস পশু? আমি যে মূল্যবান গহনা পরেছি, তুই তা চোখেও দেখিস নি।

আব্বাসউদ্দিন। তাই নাকি? বহুৎ আচ্ছা। তাহলে ত তুমি রাজা জমিদারের বাড়ীর আওরৎ। তোমায় সঙ্গে নিকে করতে পারলেই ত আমার মরদানি! এস—এস পিয়ারী, বুকে এস। [হস্তধারণ]

মন্দাকিনী। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে পিশাচ! আমি সতীনারী! আমার মর্য্যাদা নষ্ট করলে, ভগবান তোর মাথায় বজ্রাঘাত করবেন।

আব্বাসউদ্দিন। ও বজ্র-কদ্রের ভয় করবে মাগীমুখো মরদারা! আব্বাসউদ্দিন ও ভয় করে না। (সেরা খানাপিনা, সেরা আওরত ভোগ করে হাতির মত বলবান মরদরা। আমি সেই বলবান্ মরদ, তাই তোমার মত সেরা সুন্দরীকে জোর করে উপভোগ করবো।) বাচ্চাটাকে ফেলে দাও—ফেলে দাও সুন্দরী। [ক্রোড়ের শিশুকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল] দাও শীগ্‌গির দাও।

মন্দাকিনী। না—না—না—কেড়ে নিও না, আমার মাণিককে তুমি কেড়ে নিও না।

আব্বাসউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [শিশুকে কাড়িয়া লইল] তোমার বুকের মাণিক ধুলোয় পড়ে থাক। [শিশুকে মাটিতে নিক্ষেপ ও শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠিল] তুমি আমার বুক ঠাণ্ডা করবে চলো পিয়ারী!

মন্দাকিনী। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, তোর পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দে! [আব্বাসউদ্দিন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছিল] খোকা—খোকা—খোকন আমার।

[আব্বাসউদ্দিন মন্দাকিনীকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। ভূপাতিত শিশু ক্রন্দন করিতে লাগিল।]

দ্রুতপদে মাণিকের প্রবেশ।

মাণিক। চেঁচামেচির শব্দটা এইদিক থেকেই শোনা গেছে। কিন্তু একি, বাচ্চাটা কার? এখানে পড়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে। তবে কি কোন কলঙ্কিনী নারী—কিন্তু এই ত একটা মেয়ের চেঁচামেচি শুনতে পেলুম। নিশ্চয় কোন বদলোক বাচ্চার মাকে টেনে নিয়ে গেছে। তাই ত, কি করি? [শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া] একি, এর হাতে যে সোনার কবচ। [বাম হাত দেখিয়া]

একি, এ যে হীরে। নিশ্চয় কোন রাজা-মহারাজার ছেলে! কিন্তু কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি না। এতগুলো হীরে বসানো সোনার কবচ! যা থাকে কপালে, নিয়ে যাই বাচ্চাটাকে। ঘরে আমার ছেলে নেই, গিন্নী ভারী খুসী হবে। তা ছাড়া এই হীরের কবচ, ওরে বাবা! এর যা দাম তত টাকা আমি চোখেও দেখিনি। এতদিনে বোধহয় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, সাতখানা হীরে বসানো কবচের সঙ্গে রাঙা টুকটুকে ছেলে!

[শিশুকে লইয়া প্রস্থান।

দুধের পাত্র হস্তে ভবানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

ভবানন্দ। মন্দাকিনী! বাহকদের দেখা পেয়েছি। খোকার জন্যে এই দুধ—একি! মন্দাকিনী কোথায়? মন্দাকিনী—মন্দাকিনী! সাড়া শব্দ নেই। [উচ্চৈঃস্বরে] খোকা—খোকা! মন্দাকিনী—মন্দাকিনী! ওঃ! ভগবান, একি করলে? দুঃখের মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করে আমার স্ত্রী-পুত্রকেও কেড়ে নিলে? [উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া] মন্দাকিনী—মন্দাকিনী? খোকা—খোকা—খোকন—খোকন—

[উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান।

—:•:—

উনিশ বছর পরে

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

দেওয়ালীর মেলা।

[নৃত্য-গীতরত কুমারীগণ আসিল, হাতে ফুলঝুরি ও রংমশাল জ্বলিতেছিল।]

কুমারীগণ। গীত।

দেওয়ালী দেওয়ালী দেওয়ালীর কালো রাতে সারি সারি দীপ জ্বলে।
পট্ পট্ পট্ পট্কা ফুটে আকাশে উড়ে হাউই চলে।
ঝুর ঝুর ঝুর ফুলঝুরি ঝুরে,
ছোটে ছুঁচোবাজী ফুর ফুরে,
দেখো রংমশালের রঙীন আলোয় আঁধার রাতে দিন ফলে।
রাঙা আশায় আমরা চলি,
নাচবো মেলায় কথাকলি,
শুধুই গাইব না সই বাঁধাবুলি,
দেওয়ালীর গান গাইব মোরা শুনবে মেয়ে-পুরুষদলে।

[দূরে দাঁড়াইয়া সাধনা নৃত্য-গীত উপভোগ করিতেছিল। সকলে নৃত্য গীতান্তে চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"সরে যাও, কে কোথায় আছ সরে যাও, বুনো বরা ছুটছে।"]

সাধনা। এঁ্যা-বুনো বরা! হ্যা-হ্যা, এই দিকেই বরাটা ছুটে

আসছে। [চীৎকার করিয়া] কে আছ রাজপুরুষ, আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও!

অচিন্ত্য। [নেপথ্যে] ভয় নেই—ভয় নেই। আমি বুনোবরার মুখে তীর মেরেছি।

[নেপথ্যে বরাহের বিকট চীৎকার ও বহুকণ্ঠে কোলাহল—
"মরেছে—মরেছে বরাটা মরেছে"।]

তীর-ধনুক হস্তে অচিন্ত্যের প্রবেশ।

অচিন্ত্য। খুব বেঁচে গেছ, বুনোবরাটা এখুনি তোমায় দাঁত দিয়ে চিরে ফেলত।

সাধনা। [সবিস্ময়ে অচিন্ত্যের মুখের দিকে তাকাইয়া] তু—মি—

অচিন্ত্য। হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছ কি? আমি অচিন্ত্য, এই সহরে থাকি। এই যে তীর-ধনুক দেখছো, এরা আমার সঙ্গের সাথী। মা আর মধুকে নিয়ে দেওয়ালীর মেলা দেখতে এসেছিলুম। চকচকে পোষাকপরা মেয়ে-পুরুষ আর রঙমশালের আলো দেখে হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় শুনতে পেলুম হৈ-চৈ। চেয়ে দেখি বুনোবরাটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তোমার দিকে ছুটে আসছে। যেমনি দেখা, অমনি বাছাধনকে এক তীরে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম।

সাধনা। তুমি বীর।

অচিন্ত্য। দূর, বীর হবো কেন? আমি অচিন্ত্য, পাড়ার লোকেরা বলে গোঁয়ার গোবিন্দ—বকাটে ছেলে, তাই ত কেউ আমার সঙ্গে মেশে না। তা নাই মিশুক, আমার এই তীর-ধনুকই বন্ধু, ভাই, খেলার সাথী।

সাধনা। এমনি করে ওই তীর ধনুক নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছ বলেই অমন অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ তোমার। শত শত অস্ত্রধারী রক্ষী দেওয়ানী মেলা ঘিরে আছে, কিন্তু কেউ ত ওই হিংস্র বরাটার গায়ে একটা আঘাত করতে পারলে না। অথচ তুমি অনায়াসে একটা তীর মেরে ওকে হত্যা করলে!

অচিন্ত্য। এটাই আমার বাহাদুরী বলছ? কিন্তু আমি জানি, এখনো আমার লক্ষ্যভেদ ঠিক হয়নি। মহাভারতে পড়েছি, একলব্য তীর মেরে একটা শেয়ালের স্বর বন্ধ করে দিয়েছিল। যেদিন সেই রকম তীর চালাতে পারব, সেইদিন বুঝব আমার শিক্ষার শেষ হয়েছে।

সাধনা। তুমি তা পারবে বীর।

অচিন্ত্য। বীর! হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি বীর নই, বীর নই, আমি অচিন্ত্য।

মধুসূদনের প্রবেশ।

মধুসূদন। ওঃ! ভারী ত নাম, অ—চিন্ত্য! হ্যাঁ, নাম বলতে হয় আমার, মধুসূদন! দিনের ভেতর অন্ততঃ দশবার লোকে এই নাম বলে পেন্নাম করে।

সাধনা। এ কে?

অচিন্ত্য। আমার ভাই মোদো!

মধুসূদন। কি, আমি মোদো? আর তুমি? তুমি কি? মা বলে ক্যাবলা, বাবা বলে ওচো!

অচিন্ত্য। বলে ত কি হয়েছে? তারা আমায় ভালবাসে, তাই ওই নামে ডাকে।

মধুসূদন। ছাই বাসে! দিনরাত ধনুক নিয়ে থাকিস বলে ত গালাগালি বকাবকির অন্ত নেই।

সাধনা। তীর-ধনুকের সাধনার ফল গালাগালি আর বকাবকি? তুমি এর প্রতিবাদ করতে পারো না বন্ধু?

অচিন্ত্য। দরকার কি? ওতে আমার কোন দুঃখ নেই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার কাছে কিছু নয়। ভালমন্দ ভাবতেও পারি না। খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম সব ছেড়ে শুধু ডুবে থাকতে চাই এই তীর-ধনুকের সাধনায়।

সাধনা। এ সাধনার সিদ্ধিতে তুমি এমন লাভবান হবে যা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

মধুসূদন। কল্পনা? এই বানান করছি শোন, ক-ল-প দন্ত্যোনয় আকার। শুনলে ত? চ-চ বাবা, আমি যে সে ছেলে নই, দস্তুর মত দ্বিতীয় ভাগ পড়েছি। আর এই ক্যাবলা দাদা, মুখ্যু— মুখ্যু—হাড় মুখ্যু।

সাধনা। তোমার মত এঁচোড়ে পাকা বিদ্বান ছেলের চেয়ে মূর্খ হওয়া অনেক ভাল। দাদা তোমার শাপভ্রষ্ট দেবতা, আর তুমি চুপেয়ে জানোয়ার। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মধুসূদন। কি বললি ছুঁচোমুখি?

সাধনা। সাবধান! আর একবার ওকথা বললে এখনি কান ধরে মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে মেলা ঘোরাবো ডেঁপো ছেলে। [প্রস্থানোদ্যতা ও পুনরায় ফিরিয়া] এই নাও যুবক, আমার আজকের স্মৃতি। [অচিন্ত্যর হাত ধরিয়া স্বীয় অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল, তূণ হইতে একটি তীর লইয়া বলিল] আর আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমার তূণ থেকে এই তীরটা। যত্ন করে রেখে দেব আমার শয়ন কক্ষে।

যখন দেখব, তখনই তোমার এই সরল মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপটে জেগে উঠবে।

অচিন্ত্য। এ আংটি নিয়ে আমি কি করব?

সাধনা। আঙ্গুলে পরে থাকবে। তোমার কাছে গচ্ছিত রইল। আমার প্রীতির নিদর্শন, ওটা দেখে দিনান্তে একবারও মনে করো সেই মেয়েটার কথা,—দেওয়ালী মেলায় বনোবরার কবল থেকে বাঁচিয়ে যাকে চিরঋণী করেছ।

[প্রস্থান।

মধুসূদন। কি গো ক্যাবলা দা। হাঁ করে চেয়ে আছ যে? ছুঁচোমুখি মেয়েটা আমায় কি রকম অপমান করে গেল শুনতে পেলে না?

অচিন্ত্য। শুনেছি।

মধুসূদন। শুনেছ, তবে চুপ করে রইলে কেন?

অচিন্ত্য। কি করব?

মধুসূদন। এক ঘুসিতে মেয়েটার মুখ ফাটিয়ে দিতে পারলে না?

অচিন্ত্য। কই আর পারলুম।

মধুসূদন। মারবার জন্যে আমার হাতটা নিস পিস করছিল! কিন্তু কি করব? বড় ভাই তুমি সামনে রয়েছ, তাই গায়ের রাগ গায়ে মেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, নইলে এক ঘুসিতে ছুঁচোমুখির মাথাটা দুফাঁক করে দিতুম।

অচিন্ত্য। দিয়ে দেখলে না কেন?

মধুসূদন। কি হতো? বলি কি হতো?

অচিন্ত্য। মেয়েছেলের গায়ে হাত তুললে মেলা ভেঙ্গে লোক ছুটে এসে চাটি মারতে মারতে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিত।

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। চাটা মারতে মারতে কার মাথার খুলি উড়িয়ে দিচ্ছেরে ক্যাবলা?

মধুসূদন। আমার, জানো মা—আমার! একটা ছুঁচোমুখি মেয়েকে সেই বুনোবরাটা তেড়ে আসছিল, তোমার সোহাগের ছেলে তীর দিয়ে বরাটা মেরেছে বলে, মেয়েটা ওকে বললে দেবতা, আর আমাকে কি বললে জানো মা, চুপেয়ে জানোয়ার।

ভবানী। কি, আমার ছেলেকে অপমান?

মধুসূদন। শুধু কি অপমান? ছুঁড়ি আমার কান ধরে মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে মেলা ঘোরাবে বলে গেল। [ক্রন্দন]

ভবানী। লাথি মেরে ছুঁড়ির মুখখানা ভেঙ্গে দিতে পারলি নি বোকো?

মধুসূদন। দিতুম মা—দিতুম। পারলুম না শুধু তোমার এই সোহাগের ব্যাটার জন্তে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার অপমান সইলে, আবার বললে কি জানো মা সেই ছুঁচোমুখির গায়ে হাত তুললে মেলার লোকেরা চাটি মেরে আমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।

ভবানী। কোন ড্যাকরা আমার ছেলের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব, দিক ত! আমি কি কিছু বুঝতে পারিনি ক্যাবলা? আমার মধুসূদনকে তুই হিংসে করিস, তাই পদে পদে বাছাকে লোক দিয়ে অপমান করাস?

মাণিকের প্রবেশ।

মাণিক। আহা! কে তোমার বাছাধনকে অপমান করলে গিন্নী?

ভবানী। এই তোমার সোহাগের ছেলে। আ-হা, যেমন উনি, তেমনি ওনার ওচো।

মাণিক। জানো গিন্নী! আমার ওচোর আজ কত নাম? মেলা ভক্তি রক্ষীরা বনবরাটাকে মারতে পারলে না, কিন্তু বাপের ব্যাটা বাহাদুর আমার ওচো, এক তীরে বরাটাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে কত নাম কিনেছে জানো? দেশশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করছে।

ভবানী। [খিচাইয়া] আ-হা-হা, তাতেই তুমি স্বশরীরে সগ্‌গে যাচ্ছ।

মাণিক। সগ্‌গে যেতে পারবো না গিন্নী! তবে এ কথাও ঠিক, মরে আমি নিশ্চয়ই সগ্‌গে যাব। তবে এই ব্যাটা অকাল কুষ্মাণ্ড মোদোর হাতের পিণ্ডি নিয়ে নয়, আমার এই সোনার চাঁদ ওচোর হাতের পিণ্ডি নিয়ে।

মধুসূদন। শুনছো মা, শুনছো? বাবা ব্যাটার কথাগুলো শুনছো? আমিও বলে রাখছি মা, ওই কীপটে বুড়ো মলে আগে ওর লোহার সিন্দুক ভেঙ্গে মালকড়ি সরিয়ে ফেলবো তারপর যাব শ্মশানে মুখাগ্নি করতে।

[প্রস্থান।

মাণিক। দূর হ'—দূর হ' ব্যাটা অকালকুষ্মাণ্ড! তোর হাতের আগুন নিয়ে আমি নরকেও যাব না। মরে যাবার আগে সিন্দুকের টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি সব তোকে দিয়ে যাবে ওচো, তুই শুধু আমার মুখে একটু নুড়ো জেলে দিস বাবা!

অচিন্ত্য। কি বলছো বাবা?

মাণিক। বাপের যা বলা উচিত, তাই বলছি বাবা! ওরে, ওই কাল নাগিনী তোকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। ওর যত

সোহাগ ওই অকালকুষ্মাণ্ড মোদোটার ওপর। ওদের আমি কিছু দেবো না। তুই আমার বড় ভাল ছেলে। তোকে আমি সব দিয়ে যাব—সব দিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

ভবানী। বটেরে অন্নপেয়ে মিন্সে। আমার রক্তের গড়া ছেলে বানের জলে ভেসে যাবে; আর ওই উনুনমুখো পথের ছেলে হবে সর্বেসর্বা? আচ্ছা! যাই আগে বাড়ীতে, তারপর ঝগড়া করে পাড়া ফাটিয়ে দেব।

অচিন্ত্য। তোমার পায়ে পড়ি মা, যা বলতে হয় আমাকেই বল, বাবার সঙ্গে তুমি ঝগড়া করো না। [পদতলে বসিল।

ভবানী। সর্, সর্ আর সোহাগ দেখাতে হবে না।

[বামপদে ঠেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

অচিন্ত্য। ভগবান! মায়ের মন থেকে এ বিদ্বেষের বিষ সরিয়ে দাও। আমি কিছুই চাই না, চাই শুধু একটু স্নেহ—মাতৃস্নেহ। আমার হারানো সম্পদ সেই মাতৃস্নেহ ফিরিয়ে দাও!

[প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ফৈজুদ্দিনের গৃহ।

ফৈজুদ্দিন ও মন্দাকিনীর প্রবেশ।

ফৈজুদ্দিন। জুলুম, দেশে দেশে চলছে আজ ধনবানদের জুলুম। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা কাজ করে তারা পায় না খেতে, তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা বিনা চিকিৎসায় রোগে ভুগে মরে, তাদের বিশ্রাম করবার ঘর আঁস্তাকুড় আর পচা নর্দ্দামার ধার। আর যারা ব্যবসার নামে দেশের বুকে শোষণনীতি চালায় তারা বেহেস্তের মত প্রাসাদে থেকে নাচ গান করে আর সেরা খানা-পিনায় লাখ লাখ টাকা খরচ করে।

মন্দাকিনী। সেই পাপেই আজ আমি পথে দাঁড়িয়েছি বাবা! জানি না কোথায় আমার স্বামী! নয়নানন্দ ছেলে—ওঃ, সে আজ এক যুগ হয়ে গেল! বাছা আমার বেঁচে আছে কিনা জানি না।

ফৈজুদ্দিন। বেঁচে আছে মা! আমার অকালকুষ্মাণ্ড ব্যাটা তোমায় ধরে আনার পর, আমি তোমার ইজ্জৎ বাঁচিয়ে নিজে ছুটে গিয়েছিলাম বাচ্চার খোঁজে, কিন্তু দেখতে পাইনি। নিশ্চয় তোমার স্বামী বাচ্চাকে নিয়ে গিয়ে এতদিনে জোয়ান মরদ করে তুলেছে।

মন্দাকিনী। আমার বাছা এতদিনে জোয়ান হয়েছে?

ফৈজুদ্দিন। তা আর হবে না মা? উনিশ বছর আগে তুমি এই ছেলের ঘরে এসেছো। তোমাকে ধরে আনার পর থেকে আমার আব্বাসের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। মদ ছেড়েছে—মানুষ মারা কাজে আর হাত ওঠে না, কামারের কাজ শিখে কামারশালা খুলেছে।

দিব্যি করেছে তোমাকে স্বামীপুত্রের সঙ্গে মিল না করিয়ে সাদী করবে না!

মন্দাকিনী। এ জীবনে আর কি তাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে বাবা?

কৈজুদ্দিন। হবে মা—নিশ্চয়ই হবে। এ সব সেই খোদাতালার পরীক্ষা। তোমার স্বামী অনেক পাপ করেছিল, তাই এমন সতী-সাধ্বী পরিবারকে হারিয়েছে। যেদিন সে দীন দুনিয়ার মালিকের পরীক্ষা শেষ হবে, সেইদিনই তোমার স্বামী পুত্তুরের সাথে মিল হবে।

মন্দাকিনী। জন্মদাতা না হয়েও তুমি আমার নারীধর্ম্ম রক্ষা করে বাপের কাজ করেছ। আশীর্ব্বাদ কর বাবা, যেন স্বামী-পুত্রের কোলে মাথা রেখে মরতে পারি। [প্রণাম করিল]

কৈজুদ্দিন। একি করলি বেটী? ধর্ম্মের বাপ হলেও আমি যে জাতিতে মুসলমান।

মন্দাকিনী। ধর্ম্মে তুমি মুসলমান, কিন্তু জাতিতে তুমি মানুষ।

কৈজুদ্দিন। মানুষ—মানুষ! আমি মানুষ, তুই মানুষ, সারা দুনিয়ায় শুধু মানুষের মেলা। তবে একটা মানুষ কেন আর একটা মানুষকে ঘেন্না করে বলতে পারিস মা।

মন্দাকিনী। সেটা সংস্কারের দোষ বাবা! মানুষ হয়ে যারা মানুষকে ঘৃণা করে তারা পৃথিবীর অভিশাপ।

আব্বাসউদ্দিনের প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। এ কথাটা দেশের লোক এখনো স্বীকার করে নেয়নি বহিন্!

মন্দাকিনী। যারা স্বীকার করবে না, তারা দুনিয়ার ঘৃণার পাত্র থাকবে।

আব্বাসউদ্দিন। তা আর থাকছে কই বহিন্? আমি আজ তাদের হরিপুরের ভাবগতিক বুঝতে গিয়েছিলুম। খুব পিপাসা পেয়েছিল, তাই একটা ইঁদারার ধারে বালতি দেখে যেই জল খেতে গেছি, অমনি একটা লোক পেছন থেকে আমার ঘাড়ে সজোরে রদ্দা মেরে বলে উঠল,—শালা মোসলমান, হিন্দুর গেরামে এসে কাউকে জিজ্ঞেস না করে ইঁদারা ছুঁয়েছিস, হিন্দুদের জাত মারতে?

ফৈজুদ্দিন। তারপর—তারপর ব্যাটা?

আব্বাসউদ্দিন। হঠাৎ রদ্দা খেয়ে হকচকিয়ে গিয়েছিলুম বাপজান! তারপর একটু সামলে নিয়ে বললুম, ছুঁয়েছি ত হয়েছে কি? জলের আবার জাত আছে? যেই না বলা, অমনি লোকটা ঘুসি উচিয়ে আবার আমায় মারতে এল! আমি তখনি তার হাতটা ধরে ফেললুম, বাছাধন আর নড়তে পারলে না, শুধু ওরে ওরে, ওরে মেধো বলে চেঁচাতে লাগলো, আর পঞ্চাশ বাট্‌জন লোক এসে আমাকে ঘেরাও করে মারতে সুরু করে দিলে।

ফৈজুদ্দিন। ডাকাত সর্দার ফৈজুদ্দিনের ব্যাটা হয়ে তুই মার খেয়ে এলি আব্বাস?

আব্বাসউদ্দিন। মার ত ইচ্ছে করেই খেলুম বাপজান! নইলে তোর ব্যাটার কাছে পঞ্চাশ বাট্‌জন মরদ ত জলখাবার। মার খেলুম শুধু গেরামের দৌড়টা বুঝতে। আরও শোন বাপজান! লোকগুলো আমাকে মারধোর করে রাজকর্ম্মচারীদের কাছে ধরে নিয়ে গেল।

মন্দাকিনী। এতদূর গড়িয়েছে?

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ বহিন্! দেখলুম, জমিদার কেউ নেই, রাজার খাসেই জমিদারী, কাজকর্ম্ম দেখছে কর্ম্মচারীরা।

মন্দাকিনী। সেই কর্ম্মচারীদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর দেওয়ান বলে কোন বুড়ো কর্ম্মচারী নেই?

আব্বাসউদ্দিন। না বহিন্! তারা সবাই জোয়ান।

মন্দাকিনী। তারা তোমাকে কি ছেড়ে দিলে ভাই?

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছে, তবে শাস্তি দিয়ে।

কৈজুদ্দিন। কি শাস্তি? কি শাস্তি দিয়েছে রে আব্বাস?

আব্বাসউদ্দিন। দু'হাতে জল তুলে খেতে গিয়েছিলুম, তাই ওরা আমার দুটো হাতে লাল টকটকে লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। এই দেখ বাপজান! এই দেখ! [হাতের আস্তিন গুটাইয়া দেখাইল]

কৈজুদ্দিন। এঁ্যা!

মন্দাকিনী। সর্ব্বনাশ!

কৈজুদ্দিন। ওঃ! খোদা—খোদা! ডাকাত হয়েছিলুম রাজার অত্যাচারে, আজ আবার বাপ-বেটায় ডাকাতি ছেড়ে গেরস্থ হয়েছি এই দেবী মায়ের হুকুমে। তার বকশিস কি আমার ব্যাটার হাতে এই লোহা পোড়ার ছাঁকা দেখতে হলো?

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ বাপজান! তাই—তাই। পিপাসায় জল তারা আমায় এক ফোঁটাও দেয়নি, শুধু দিয়েছে গালাগালির চাবুক, আর লোহা পোড়ার ছাঁকা।

কৈজুদ্দিন। ও ছ্যাঁকা তারা তোর দু'হাতে দেয়নি বাপজান, দিয়েছে এই বুড়ো কৈজুদ্দিনের বুকে।

মন্দাকিনী। না বাবা! তারা তোমার বুকে ছ্যাঁকা দেয়নি,

[দি]য়েছে তোমার ধর্ম্মমায়ের সর্ব্বাঙ্গে। ভাইজান গিয়েছিল আমার চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্তে হরিপুরে খোঁজ খবর নিতে, নিষ্ঠুর প্রজারা ওকে পিপাসার জল দেয়নি, দিয়েছে শুধু কঠিন আঘাত। এর প্রতিদানে তোমাদের উনিশ বছরের অনভ্যস্ত হাতে আবার আমিই তুলে দেবো ডাকাতির লাঠি।

ফৈজুদ্দিন। মা! মা!

আব্বাসউদ্দিন। বহিন্! বহিন্!

মন্দাকিনী। আমারই হুকুমে তোমরা গতর খাটিয়ে খাচ্ছো, আবার আমি হুকুম দিচ্ছি ভাইজান, দলবল সাজিয়ে মেতে ওঠো ডাকাতির নেশায়। তবে এ ডাকাতি এবার বিভিন্ন দেশে নয়, শুধুই চলবে পদ্মনগরের রাজা মুকুটসিংহের এলাকায়।

আব্বাসউদ্দিন। তাই হবে বহিন্—তাই হবে! তোরই হুকুমে আমরা ডাকাতি ছেড়েছিলুম, আবার তোরই হুকুমে উনিশ বছর পরে অনভ্যস্ত হাতে ডাকাতির লাঠি ধরতে চলেছি।

ফৈজুদ্দিন। ডাকাতির লাঠি না ধরে এই উনিশ বছরে বুড়ো ফৈজুদ্দিনের কব্জির জোর কমে গেছে মা, তবু তোর হুকুমে আবার লাঠি ধরে তার ব্যাটাকে শাস্তি দেওয়ার মজাটা পদ্মনগরের রাজাকে বুঝিয়ে দেবো। উনিশ বছর আগে ডাকাতির টাকায় দলবল নিয়ে ফৈজুদ্দিন মদ খেয়েছে, বাঈজীর নাচ দেখেছে, এই ডাকাতির আড্ডাকে সে নরক বানিয়ে রেখে এসেছে; কিন্তু এবারের ডাকাতি করা টাকা সে শুধু গরীব ভাই বোনদের কল্যাণেই খরচ করে যাবে।

মন্দাকিনী। তাই কর বাবা—তাই কর! আমার স্বামী আর রাজা মুকুটসিংহ গরীবের কল্যাণে এক কপর্দকও খরচ করেনি, তোমরা

পদ্মনগর রাজ্যের ধনী-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা কেড়ে এনে গরীব ভাই-বোনদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।

আব্বাসউদ্দিন। তাই দেব বহিন্—তাই দেব। আমাদের ডাকাতির টাকায় গরীব ভাই বোনেরা খেতে পরতে পাবে, তাদের ছেলে-মেয়েরা বিনা খরচে লেখা পড়া শিখবে, অসুখ-বিসুখে ওষুধ পাবে, আর পাবে সব জাত একসঙ্গে মিলে মিশে পূজো-পার্ব্বণ ক'রতে। জাত-অজাত, উচ্চনীচ বিচার করে ঘরের ভাইকে যারা পর করে দেয়, তাদের ধ্বংস করে আমরা ডাকাতের আড্ডা ভেঙ্গে গ'ড়ে তুলবো হিন্দুর মন্দির, আর মুসলমানের মস্‌জিদ।

[প্রস্থান।

কৈজুদ্দিন। হিন্দুর সেই মন্দিরে কোন পূজারী থাকবে না পূজো ক'রতে, মুসলমানের মসজিদে কোন মৌলভী থাকবে না লোবান জ্বালাতে। সাঁঝের কালো আঁধার যখন নেমে আসবে দুনিয়ার বুকে, তখন হিন্দু-ভাইবোনেরা দীপ জ্বেলে আস্‌বে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়ে দেবতার আরতি করতে। মুসলমান ভায়েরা দলে দলে আসবে আজানের ডাকে খোদাকে বরণ করতে; হিন্দুর শাঁখ ঘণ্টা আর মুসলমানের আজানের ধ্বনি এক হয়ে অনন্ত আকাশের বুকে ছড়িয়ে দেবে এক মহামানবতার ঐক্যতান।

[উভয়ের প্রস্থান।

—:•:—

তৃতীয় দৃশ্য

পদ্মনগর—রাজোদ্যান।

গীতকণ্ঠে কানাইসিংহের প্রবেশ।

কানাইসিংহ। **গীত।**

বনকুসুমের মালা গেঁথে পরবো আমি সকাল বেলায়।
বুনো পাখী ল্যাজ নাচিয়ে করছে খেলা ছাতিমতলায়।
কাঁচা আমের চাটনী মিঠে,
পড়ে যদি নুনের ছিটে,
পাই না খেতে মনের সুখে মদন মালীর ধমকী তাড়ায়।
যোগ সাজোস আজ দিদির সাথে,
তাই এসেছি ছুরি হাতে,
আম কুচিয়ে তুলবো পাতে, ঝাল মিশিয়ে ফেলবো নোলায়।

সাধনার প্রবেশ।

সাধনা। কানাই—কানাই! আম পেড়ে নিয়ে শীগ্‌গির চলে আয়, মা আসছেন ফুল তুলতে।

কানাইসিংহ। এঁ্যা! মা আসছেন! কেন, মাধবীটা গেল কোথায়?

সাধনা। মাধবীর জ্বর হয়েছে।

কানাইসিংহ। দেখ দেখি জ্বরের আক্কেল। বুঝে সুঝে ঠিক সময়েই মাধবীকে ধ'রে বসলো।

সাধনা। ধরেই যখন বসেছে, তখন ত আর উপায় নেই। যা—যা, শীগ্‌গির আঁকসী দিয়ে আম পেড়ে নিয়ে আয়।

কানাইসিংহ। হা আমার পোড়াকপাল! আঁকসীও কি চাই

সামনে আছে? ওই হতচ্ছাড়া মদনমালীর জ্বালায় গেলুম—দিদি গেলুম। আঁকসীটা ওর রান্নাঘরের চালার উপর তুলে রেখে দিয়েছে

সাধনা। তাহলে উপায়?

কানাইসিংহ। উপায় একটা করেছি দিদি। আগে বল, কাউকে বলবি নি!

সাধনা। নারে। কি উপায় বলনা?

কানাইসিংহ। আমের চাটনী করবার জন্যে ভাঁড়ার ঘর থেকে যে লঙ্কা চুরি করে এনেছি, তা থেকে দুটো লঙ্কা মদনার তামাক খাবার আগুনে ফেলে দেবো। লঙ্কা দুটো পুড়ে যেই ঝাঁঝ বেরুবে, অমনি পালিয়ে এসে ওর রান্নাঘরের পেছনে লুকিয়ে থাকবো। সেই ঝাঁঝে ওর নাক জ্বালা করলে যেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, অমনি আমি আঁকসীটা রান্নাঘরের চালা থেকে পেড়ে নিয়ে আম-গাছের দিকে চলে যাব।

সাধনা। বাঃ! তোর বুদ্ধি ত বেশ। যা—যা, তবে শীগ্‌গির কাজ সেরে ফেল্‌ কানাই। দেরী করলে মা এসে পড়বে।

কানাইসিংহ। আমি ঝাঁ করে যাব আর আসব। এ্যাঁ, মা এসে পড়ল? আর আমি যাব না, যাব না, যাব না। এই এখানে গোঁজ গেড়ে বসলুম।

সাজিহস্তে সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদামিনী। কেন রে কানাই কি হল?

কানাইসিংহ। গীত।

সব মতলব ফেঁসে গেল!

গাছে রইল গাছের ফল মা মুন-লঙ্কা আনা বৃথাই হলো।

টসটসে জল ঝরছে নোলায়,
যেন ভাজা মটর তপ্ত খোলায়,
খেতুম আমের চাটনী সকালবেলায় এখন সব আশাতেই ছাই পড়িল।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

সৌদামিনী। কানাই—ওরে কানাই!

কানাইসিংহ। প্রতিজ্ঞা পালন কিংবা শরীর পতন ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা মা! নুন লঙ্কা চুরি করে এনেও যখন গাছের আম গাছেই রয়ে গেল, তখন না খেয়ে শরীর পতনই আমার প্রতিজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সাধনা। কানাই ভারী রেগে গেছে মা! সে অনেক কষ্টে ভাড়ার থেকে নুন লঙ্কা চুরি করে এনেছিল, আঁকসী দিয়ে কাঁচা আম পেড়ে চাটনী খাবে বলে।

সৌদামিনী। তা আমি তোদের দুজনকে দেখেই বুঝে নিয়েছি। এত বড় মেয়ে হলি এখনও তোর ছেলেমানুষী গেল না রে?

সাধনা। আমি আবার কি করলুম মা?

সৌদামিনী। কানাইকে পড়াশুনায় উৎসাহ না দিয়ে, ভাড়ার থেকে নুন লঙ্কা চুরি করে এনে বাগানের কাঁচা আম পেড়ে চাটনী করে খাওয়া, যেখানে সেখানে যাওয়া, নদীতে সাঁতার কাটা। এই ত দেওয়ালীর দিন একা মেলা বেড়াতে গিয়ে বুনোবরার কবলে পড়ে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি।

সাধনা। সত্যি মা! সেদিন দেওয়ালীর মেলায় রক্ষীগুলো বুনো বরাটাকে দেখে বন্দুক ফেলে দিয়ে পালিয়েছিল। ভাগ্যিস দেবদূতের মত ছেলেটা এসে আমার প্রাণ বাঁচালে, নইলে কি যে হতো?

সৌদামিনী। অতবড় উপকারটা যে করলে, তাকে একবার নিয়ে এলি নি মা?

সাধনা। আসবে মা, সে নিশ্চয়ই আসবে। আমি তার পরিচয় নিয়ে জেনেছি সে কোন গ্রামবাসী নয়, এই সহরেই থাকে।

মুকুটসিংহের প্রবেশ।

মুকুটসিংহ। কে এই সহরে থাকে কন্যা?

সৌদামিনী। দেওয়ালীর মেলায় বুনোবরা মেরে যে ওর প্রাণরক্ষা করেছিল।

মুকুটসিংহ। লোকমুখে তার অনেক প্রশংসাই শুনেছি। কিন্তু আমার রাজধানীতে এমন অব্যর্থ সন্ধানী ধনুর্ব্বিদ কে আছে তা ত জানতে পারিনি।

সৌদামিনী। তাকে খোঁজ করে এনে রাজসরকারে একটা চাকরি দাও না মহারাজ!

সাধনা। তার মত ছেলেরা দাসত্বের শৃঙ্খল পরে না মা!

সৌদামিনী। সেকি! রাজসরকারের চাকরির জন্যে কত লোক ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছে।

সাধনা। যারা আছে, তারা গোলামীর সাধনা করছে মা! কিন্তু সেই ছেলেটা সাধনা করছে স্বাধীন বীরত্বের।

সৌদামিনী। বেশ ত। চাকরি করতে না চায়, উপকারের প্রতিদানে না হয় দু'চার হাজার টাকা পুরস্কার দাও।

সাধনা। চাকরিকে যে গ্রাহ্য করে না, তার কাছে দু'চার হাজার ত তুচ্ছ মা, দু'চার লাখেরও কোন মূল্য নেই!

সৌদামিনী। তাহলে সে কিছুই নেবে না?

সাধনা। তা বলতে পারি না! তবে টাকা বা চাকরির আশা যে করে না, এ কথা আমি জোর করেই বলতে পারি।

মুকুটসিংহ। যে নিতে চায় না, তাকে জোর করে দিয়ে আমি তার মহত্বের অমর্য্যাদা করবো না। সাধনার মুখে তার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে বুঝেছি, পদ্মনগরের মাটিতে শুধু বিষ ফলই ফলে না, অমৃত ফলও ফলে।

বন্দী কৈলাসকে লইয়া ভানুসিংহের প্রবেশ।

ভানুসিংহ। সে অমৃত ফল এই সুবিধাবাদীরাই ভোগ করে দাদা!

মুকুটসিংহ। হুঁ! কে এই লোকটা—

ভানুসিংহ। বিপ্লবীদের নায়ক কৈলাস চাষী।

কৈলাস। একা কেউ বিপ্লব চালাতে পারে না মহারাজ।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। কৈলাসের এ কথা সত্য মহারাজ! হরিপুরে বিপ্লব আন্দোলন চালাচ্ছে চাষী প্রজারা।

মুকুটসিংহ। সেই জোটের মধ্যে কৈলাসও একজন।

ভানুসিংহ। নিশ্চয়। সভা-সমিতি আর মিছিল করে লোক ক্ষ্যাপানো সব কাজেই ওর উৎসাহ বেশী।

মুকুটসিংহ। সেই বেশীটাকে কমিয়ে দিতে ওকে অন্ধকার কারাগারে রেখে দাও। খেতে দেবে সপ্তাহে মাত্র দুদিন। আর যতদিন না রাজভক্ত হয়, ততদিন প্রতি প্রভাতে করবে পঞ্চাশ ঘা বেত্রাঘাত।

সিদ্ধেশ্বর। তাতে উল্টো ফল হবে মহারাজ! শাস্তি যদি দিতে হয়, তাহলে গোটা হরিপুরের প্রজাদের একসঙ্গে শাস্তি দিন।

কৈলাস। গোটা হরিপুর প্রজাদের একসঙ্গে শাস্তি দিলে রাজ-শক্তিও রেহাই পাবে না দেওয়ান মশাই!

সিদ্ধেশ্বর। কি হবে? কি হবে রে ছোটলোক?

কৈলাস। শাস্তিদাতাদের ধরে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে।

ভানুসিংহ। তার আগেই তোকে আমরা হত্যা করবো ছোট-লোক! [কশাঘাত করিল]

কৈলাস। গীত।

কর কশাঘাত, নয় এ আঘাত, জাগার প্রেরণা এ যে!
কতদিন আর শাসন চাবুক চালাবে সমান তেজে।
দেরী নাই, দেরী নাই মিলেছে শ্রমিক ভাই,
ধনী রাজা সকলের হাতে দেবে ধুলো ছাই,
আকাশের বুকে আজ সে ছবি দেখিতে পাই,
যেতে হবে তোমাদের ভিখারী সেজে।

মুকুটসিংহ। যারা আমাদের ভিখারী সাজাতে চায়, তাদের প্রতি দয়া-মায়া নয় ভানু, দিতে হবে কঠিন আঘাত। যাও, বেত্রাঘাত করতে করতে এই বিদ্রোহী প্রজাকে নিয়ে হরিপুরে ফিরে যাও। এর সঙ্গীদের দমনে দশহাজার সৈন্ত পাঠাচ্ছি, যদি বিনা রক্তপাতে সকলকে বন্দী করতে পার ভাল, আর তা যদি না পার গুলি চালিয়ে কুকুরের মত হত্যা করবে।

সিদ্ধেশ্বর। বিপ্লবী ব্যাটারা এবার মাথা নীচু করে রাজভ্রাতার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দেবে।

কৈলাস। বিপ্লবীরা তোমার মত পা চাটা কুকুর নয় দেওয়ান।

সিদ্ধেশ্বর। কি বললি ছোটলোক? আমি পা-চাটা কুকুর?

কৈলাস। শুধু কুকুর নয়—নেড়ি কুকুর।

সিদ্ধেশ্বর। আচ্ছা, এইবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। চলুন,—চলুন ছোটরাজা, ব্যাটাকে মারতে মারতে হরিপুরে নিয়ে চলুন; আমি নিজে গিয়ে ওদের বিপ্লব আন্দোলনের আদ্যশ্রাদ্ধ করে দিচ্ছি।

কৈলাস। তার আগেই তোমাদের আদ্যশ্রাদ্ধ হবে বেইমান!

ভানুসিংহ। এই যে আদ্যশ্রাদ্ধ করাচ্ছি। চল—চল, ছোটলোক চাষী ব্যাটা। [প্রহার করিতে করিতে কৈলাসকে লইয়া প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। [স্বগত] এই প্রথম দাবার চাল দিলুম, কৈলাসকে উপলক্ষ্য করেই কিস্তিমাৎ করবো।

মুকুটসিংহ। তুমিও কি হরিপুরে যাচ্ছ সিদ্ধেশ্বর?

সিদ্ধেশ্বর। যেতে হবে বৈকি মহারাজ! মেজোরাজা একা জাল ফেলে বড় বড় রুই কাতলাকে ড্যাঙ্গায় তুলতে পারবেন না।

মুকুটসিংহ। হরিপুরের চাষীদের কি দাবী?

সিদ্ধেশ্বর। দাবী একেবারে মামারবাড়ীর আব্দার।

মুকুটসিংহ। কি রকম?

সিদ্ধেশ্বর। লাখ টাকা খরচ করে খাল কাটিয়ে চাষের জল এনে সুবিধা করে দাও, আর হরিপুরের জমিদারী চালাবার ভার দাও প্রজাদের উপর।

মুকুটসিংহ। তাহলে প্রজারা চায়—

সিদ্ধেশ্বর। স্বায়ত্বশাসন।

মুকুটসিংহ। তোমার কি অভিমত?

সিদ্ধেশ্বর। আরে রাম কহো। ও অন্যায় আবদার মেনে নেওয়া অসম্ভব। আজ হরিপুরে স্বায়ত্ব-শাসন চাইছে, কাল চাইবে গোটা পদ্মনগর পরগণার স্বায়ত্ব-শাসন।

মুকুটসিংহ। এই যে স্বায়ত্ত-শাসন দিচ্ছি! দশহাজার সৈন্য নিয়ে তুমি নিজে যাও সিদ্ধেশ্বর! মিষ্টি কথায় ওরা রাজভক্ত হয় ভাল, না হয় গুলি করে হত্যা করে ওদের মাথার খুলিগুলো গেঁথে নগরের মধ্যে মিনার গড়িয়ে রাখবে, আর তার গায়ে লিখে দেবে বেইমানির স্মৃতিস্তম্ভ। [সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

সাধনা। এ যে পৈশাচিক কীর্ত্তি বাবা।

মুকুটসিংহ। যারা রাজার নুন খায়, তারা নিমকহারামী করলে এর চেয়েও কঠোর দণ্ড দিতে হয় মা!

[প্রস্থান।

সাধনা। ও পৈশাচিকতা থেকে বাবাকে তুমি রক্ষা কর মা! নইলে সর্ব্বনাশ হবে।

সৌদামিনী। অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে আমি তাকে কোন অনুরোধ করতে পারবো না।

[প্রস্থান।

সাধনা। কেউ বুঝবে না—কেউ বুঝবে না এ যুগের দাবী।

ফকিরের ছদ্মবেশে আব্বাসউদ্দিনের প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। যদি বুঝেই থাকো, তাহ'লে বাপের কাছে পড়ে আছ কেন রাজকন্যা?

সাধনা। কে তুমি?

আব্বাসউদ্দিন। দেখতেই ত পাচ্ছো আমি ফকির।

সাধনা। বাগানে ঢুকলে কি করে?

আব্বাসউদ্দিন। ওই পেছনের পথ দিয়ে।

সাধনা। [চমকিত হইয়া] কেন? কেন ঢুকেছ তুমি?

আব্বাসউদ্দিন। এক চাষীকে তোমার বাবা বেঁধে আনছিল, পাঁচীলের উপর বসে তোমার বাবার বিচার দেখলুম। বুঝলুম, এক তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া এ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার আর পথ নেই।

সাধনা। সেকি! আমাকে সরিয়ে নিয়ে—

আব্বাসউদ্দিন। আমাদের ডেরায় আটকে রেখে তোমার বাবাকে খবর দেব। খবর শুনে যদি প্রজাদের দাবী মেটায় তাহলে আবার ফিরে আসবে, নইলে সেইখানেই থাকবে।

সাধনা। এত জুলুম কর কিসের বলে?

আব্বাসউদ্দিন। জনশক্তির বলে। যাক, তর্ক করতে চাই না। এখন সোজা কথায় যাবে—না অন্য পন্থা ধরাবে?

সাধনা। যদি না যাই?

আব্বাসউদ্দিন। জোর করে নিয়ে যাব।

সাধনা। হাজার হাজার অস্ত্রধারী সৈন্য—

আব্বাসউদ্দিন। আছে ফৌজখানায়, বাগানের সামনে, দুর্গের দুয়ারে; আর আমি নিয়ে যাব ওই পাঁচীলের উপর দিয়ে খাল পার হয়ে।

সাধনা। তাহলে তুমি ফকির নও—ডাকাত।

আব্বাসউদ্দিন। ডাকাত। [ছদ্মবেশ উন্মোচন]

সাধনা। ও, তাহলে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছ, আমার গায়ে হীরে-জহরতের গহনার লোভে?

আব্বাসউদ্দিন। হীরে-জহরতে গরীব ভাই-বোনদের কিছু সাহায্য হবে, কিন্তু হরিপুরের হত্যাকাণ্ড বন্ধ হবে না। সেই মহান্ কাজটার সুযোগ নিতেই আমি তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাব।

সাধনা। কারও সাধ্য নেই, বাবার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। [চীৎকার করিতে গেল] এই কে—

আব্বাসউদ্দিন। [বিষাক্ত ছুরি বুকের উপর ধরিয়া] চুপ্! চেঁচাবার চেষ্টা করলে এই বিষ মাখানো ছোরাটা বুকে বসিয়ে দেব, মুহূর্ত্তে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যাবে।

সাধনা। না—না, আমাকে মেরো না।

আব্বাসউদ্দিন। বেশ, তবে চল!

সাধনা। পাঁচীলে আমি উঠ্‌বো কি করে?

আব্বাসউদ্দিন। আমার কাঁধে ভর দিয়ে।

সাধনা। সেকি! তুমি—

আব্বাসউদ্দিন। ডাকাত, কিন্তু ভাই।

সাধনা। [সবিস্ময়ে] ভা-ই!

আব্বাসউদ্দিন। আমি একা নই, আরো দু'শো ভাই লাঠি বন্দুক নিয়ে পেছনের জঙ্গলে অপেক্ষা কচ্ছে, তারাই তোমাকে নামিয়ে নেবে।

সাধনা। সেকি! অতগুলো অচেনা পুরুষ, বিশেষতঃ ডাকাত, তাদের বিশ্বাস কি?

আব্বাসউদ্দিন। তাদের যদি বিশ্বাস করতে না পারো—তাহলে দেহরক্ষী সৈনিকদের উপর নির্ভর করে নিঝুম রাতে বার হও কি করে?

সাধনা। তারা বিশ্বাসী।

আব্বাসউদ্দিন। মাইনের বিনিময়ে বিশ্বাসী। কিন্তু রাজকন্যাকে মা-বোনের চোখে দেখতে পারে না। আর আমরা গরীবের সেবার হয়েছি ডাকাত, তাই নারীমাত্রেই দিই মায়ের মর্য্যাদা।

সাধনা। [সবিস্ময়ে] দস্যু!

আব্বাসউদ্দিন। দেবীর মত, মায়ের মত, ভগ্নীর মত তোমাকে রেখে দেবো। রাজভোগ দিতে না পারি দেবো মোটা চালের ভাত আর ভায়ের ভালবাসা।

সাধনা। তাহলে চল, দেখে আসব সেই সর্ব্বহারার দলকে, যারা বিশ্বের শোষিত মানুষের কল্যাণে মুক্তির বোধন বসিয়েছে।

আব্বাসউদ্দিন। এস বহিন্, তোমার ডাকাত ভাই তোমাকে মাথায় করে নিয়ে যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

--:•:—

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

[সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।
ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত ভবানন্দের প্রবেশ। তাহার
মাথায় রুক্ষ কাঁচা-পাকা-লম্বা চুল, মুখে লম্বা
গোঁফ দাড়ি, চক্ষু কোঠরগত, কাঁধে ছেঁড়া
কাপড়ের ঝোলা, হাতে বড়
টিনের কৌটা।]

ভবানন্দ। [উন্মত্তের মত চীৎকারে] মন্দাকিনী! মন্দাকিনী! খোকা-খোকা! কই কারও ত সাড়াশব্দ নেই? কে সাড়া দেবে? তারা কি আর বেঁচে আছে? না—না,—নেই, তারা কেউ বেঁচে নেই। একটা একটা ক'রে দিন গুণে আসছি, ঠিক হিসেব রেখেছি, উনিশ বছর পার হয়ে গেছে। এতদিনেও যখন সন্ধান পেলুম না, তখন

নিশ্চয় তারা মরে গেছে—মরে গেছে। ওঃ, নিষ্ঠুর ভগবান! এমন কি মহাপাপ করেছিলুম যে উনিশ বছরেও তার প্রায়শ্চিত্ত হলো না? না, আর চুপ করে থাক্‌বো না! এইবার ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তুমুল যুদ্ধ করব। [মেঘগর্জ্জন] হাঃ-হাঃ-হাঃ, এসেছে—ভগবানের মহা অস্ত্র নেমে এসেছে। ওগো ব্রহ্ম-অস্থি নির্ম্মিত মহাশক্তি, এস নেমে এস কড়্ কড়্ শব্দে, আমি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি।

লাঙ্গল কাঁধে গাহিতে গাহিতে চাষীর প্রবেশ।

গীত।

ওরে ও টুকরো মেঘের দল।
আকাশের কোল ছেড়ে তোরা নেমে আসবি কখন বল।
জুড়ছে মেঘ সব থাকে থাকে,
বইছে বাদল-বাতাস তারই ফাঁকে,
কড়্-কড়া-কড়্ আকাশ ডাকে যেন বাজে নাচের মাদল।
চাষীর মনে চাষের নেশা,
দুনিয়ায় তার এটাই পেশা,
ফুটে সবার গলায় গানের ভাষা নাম্‌লে মাঠে বৃষ্টি-বাদল।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

ভবানন্দ। [সহসা চাষীর হাত ধরিয়া] আমার মন্দাকিনী আর খোকাকে দেখেছ?

চাষী। এঁ্যা! ওরে বাবা, এ আবার কে?

ভবানন্দ। ব'ল না—ব'ল না ভাই, মন্দাকিনী আর খোকাকে দেখেছ?

চাষী। [স্বগত] পাগল? না ভোল ধ'রে এসেছে, এ নিশ্চয়ই

চাই? উ-হুঁ, এখন যাওয়া হবে না। আগে যাই, গিন্নীকে ঘর-দোর সামলাতে বলে আসি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ভবানন্দ। উত্তর না দিয়েই চলে যাচ্ছ? তাহলে তুমি, তুমিই আমার মন্দাকিনী আর খোকাকে ধরে রেখেছ? বল—বল, কোথায় তারা? নইলে আমি তোমায় খুন করব।

চাষী। বটেরে শালা; তবে মর।

[লাঙ্গলের ঘা মাথায় মারিয়া প্রস্থান।

ভবানন্দ। ওঃ! [পড়িয়া গেল ও মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িল] ভগবান—ভগবান! তুমি দেখতে পাচ্ছ? না চোখ বুজে আছ? [মাথা হইতে ডহাতে রক্ত মাখিয়া] নাও—নাও, তাজা রক্তের পুজো নাও ঠাকুর! রক্ত খাও—রক্ত খাও—রক্ত খাও!

[প্রস্থান।

কলসীকাঁখে গীতকণ্ঠে গ্রাম্যরমণীগণের প্রবেশ।

গ্রাম্যরমণীগণ। গীত।

কালো মেঘের দেওয়ায় ঘটো জল নিয়ে চল পা চালিয়ে।
দিনটা মিছি নয় সুবিধে, চোর-ডাকাত সব রয় ওঁড়িয়ে।
আয়লো নফর আয় গোলাপ সই,
এখনো বুড়িপিন্নী আমরা তো নই,
জোয়ান বয়েস তাই ভয়ে রই হাত ধরে কে যাবে পালিয়ে।

[হাস্তে লাস্তে গাহিতে গাহিতে প্রস্থানোদ্যোগ]

ভবানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

ভবানন্দ। পিপাসা! বড় পিপাসা! কে আছ বন্ধু, একটু জল

দাও! এই যে, তোমরা কলসী ভরে জল নিয়ে যাচ্ছ, আমাকে একটু জল দাও!

১ম রমণী। ওলো! এ মিন্সে নিশ্চয়ই চোর, কার বাড়ীতে ঢুকেছিল—দিয়েছে মাথা ফাটিয়ে।

ভবানন্দ। না—না, আমি চোর নই, দুঃখী ভিখারী। দাও না—দাও না গো, একটু জল। বড় পিপাসা! দাও—দাও, একটু জল দাও।

২য় রমণী। ও সব ঢং আমরা বুঝি। পালিয়ে আয় লো—পালিয়ে আয়। রামায়ণ পড়িস নি? ভিক্ষে দিতে গিয়েছিল বলে রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল।

সকলে। চল—চল্, পালিয়ে চল্! [সকলের প্রস্থানোদ্যোগ]

ভবানন্দ। না—না, যেতে পাবে না। আমার পিপাসার জল না দিয়ে তোমরা এক পাও যেতে পাবে না। [পথ রোধ করিয়া] দাও—দাও, জল দাও। [অগ্রসর]

সকলে। ওগো, কে আছ, ডাকাত—ডাকাত। রক্ষা কর—রক্ষা কর।

লাঠি হস্তে অচিন্ত্যার প্রবেশ।

অচিন্ত্যা। ভয় নেই—ভয় নেই। এখুনি লাঠির ঘায়ে ডাকাতের—[সহসা ভবানন্দের চোখে চোখ পড়িতেই যেন দুর্ব্বলতা আশ্রয় করিল। উত্থিত লাঠি ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িল, সেই অবসরে রমণীগণ পলাইয়া গেল। ভবানন্দ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।] কে—কে তুমি? তোমার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে কেন?

ভবানন্দ। [মুগ্ধনেত্রে নিজের অজ্ঞাতে দু'এক পদ অগ্রসর

হইতে হইতে চাপাস্বরে] কে—কে? ওরে যাদুকর, কে—কে তুই? [প্রবলভাবে বাচ উত্থিত হইল] আয়—আয়, আমার বুকে আয়।

গহনার বাক্স বগলে মাণিকের প্রবেশ।

মাণিক। বাপ্‌রে বাপ, ডাকাত—ডাকাত! এঁ্যা, ও বাবা! ওরে, ও ওচো! ওই পাগলাটার মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে, ডাকাত মনে করে তুই বুঝি ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিস?

অচিন্ত্য। [একদৃষ্টে ভবানন্দের দিকে চাহিয়া] না বাবা।

মাণিক। ওকি রে! পাগলাটার দিকে অমন করে চেয়ে আছিস কেন? ওচো—ওরে ওচো! এদিকে ফের। [অচিন্ত্যকে আকর্ষণ করিল]

ভবানন্দ। না—না, ভেঙ্গে দিও না, মধুর ধ্যান ভেঙ্গে দিও না। দেখতে দাও, আমাকে দেখতে দাও।

মাণিক। সর্—সর্ পাগলা! মারব এক চড়।

অচিন্ত্য। মেরো না বাবা, লোকটা বড় অসহায়।

মাণিক। ওর চেয়ে অসহায় আমরা রে ওচো—আমরা। ঝড় উঠল, চল্—চল্ শীগ্‌গির চল্, ওই সামনের গাঁয়ে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।

অচিন্ত্য। বাবা—বাবা!

মাণিক। দেরী করিস নি ওচো, গহনার বাক্স নিয়ে ঝড় জলের সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সং দেখছিস্ নাকি? চল্—চল্, শীগ্‌গির চল্।

[অচিন্ত্যকে ঠেলিয়া লইয়া গেল।

ভবানন্দ। না—না, ওকে নিয়ে যেও না! একবার, শুধু একবার

ওই মায়ার পুত্তলিকে আমায় বুকে নিতে দাও। উনিশ বছরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার শান্তি করতে দাও। আমার স্নেহ মন্দাকিনী ধারায় ওকে স্নান করতে দাও। [অচিন্ত্যকে জড়াইয়া ধরিতে গেল, মাণিক তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া অচিন্ত্যকে লইয়া গেল।] ওঃ—ভগবান! ভগবান! বাইরের ঝড় জলের সঙ্গে আমার বুকের মধ্যেও ঝড় উঠেছে ওই মায়াবী ছেলেটাকে দেখে। আকাশ ফাটা মেঘের ডাক গুরু গম্ভীর স্বরে বলছে—ওরে হতভাগা, ওকে ছেড়ে দিস নি, ওকে ছেড়ে দিস নি। তোর উনিশ বছরের হারিয়ে যাওয়া মাণিকের সন্ধান মিলেছে।

[প্রস্থান।

—:•:—

পঞ্চম দৃশ্য।

পদ্মনগর রাজপ্রাসাদ।

মুকুটসিংহ ও সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

মুকুটসিংহ। নেই—নেই। আমার আদরিণী কন্যা আজ প্রাসাদে নেই। রাজধানীর চারিদিকে শত শত রাজকর্ম্মচারী খোঁজ করে এল, কিন্তু কেউ তার সন্ধান দিতে পারলে না। কি হল সিদ্ধেশ্বর, কোথায় হারিয়ে গেল আমার সোনার প্রতিমা?

সিদ্ধেশ্বর। এত খুবই আশ্চর্য্যের কথা মহারাজ! হরিপুর বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি, আর ঠিক সেই সময়ে রাজকুমারীর অন্তর্ধান হয়ে গেল।

মুকুটসিংহ। কেউ তাকে কড়া কথাও বলেনি, অথচ—

সিদ্ধেশ্বর। রাজকুমারী নিখোঁজ।

কানাইসিংহের প্রবেশ।

কানাইসিংহ। বাবা—বাবা, দিদি কোথায় বাবা?

মুকুটসিংহ। কি উত্তর দোব বল ত সিদ্ধেশ্বর?

কানাইসিংহ। উত্তর দিচ্ছ না কেন বাবা? বল না, দিদি কোথায়?

মুকুটসিংহ। উত্তর নেই কানাই—এ প্রশ্নের জবাব নেই। মা আমার কেন গেল, কোথায় গেল কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

কানাইসিংহ। দিদি বুঝি রাগ করে লুকিয়ে আছে?

মুকুটসিংহ। এ্যাঁ, তাও কি সম্ভব? হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে! হরিপুরের বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করতে আমি তোমায় হুকুম দিয়েছিলুম সিদ্ধেশ্বর, তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে। সে কথা শুনে মা আমায় বলেছিল—"এযে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা বাবা"। কিন্তু আমি সে কথায় কর্ণপাত করিনি। তাই কি অভিমানি মা আমার লুকিয়ে থেকে আমায় কাঁদাচ্ছে?

কানাইসিংহ। তাই যদি থাকে বাবা, তাহলে আমি ঠিক দিদিকে ধরে আনব।

মুকুটসিংহ। কেমন করে আনবি কানাই?

কানাইসিংহ। দিদি আমার গান শুনতে ভালবাসে, আমি গানের সুরে দিদিকে টেনে আনব।

মুকুটসিংহ। তা যদি পারিস কানাই, তাহলে তোর বাবা তোকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করবে।

কানাইসিংহ। তোমার আশীর্ব্বাদ ত সব সময়ই পাচ্ছি বাবা! আমি আশীর্ব্বাদ চাই না, চাই দিদির কাছে থাকতে।

মুকুটসিংহ। সে আশা তোর পূর্ণ হোক কানাই! ডাক—ডাক পুত্র, তাকে ডাক।

কানাইসিংহ। গীত।

কোথা আছো ওগো দিদি আমার ফিরে এস—ফিরে এস।
তোমার কানাই কাঁদে যে অঝোরে মুছে আঁখিজল ভালবেসো।
কাঁদে বাবা-মা নীরব যে টিয়া,
পড়াবে কে তারে সর-ননী দিয়া,
বিরহে তোমার ফেটে যায় হিয়া ওগো মানিনী-দিদি ফিরে এস।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

মুকুটসিংহ। সে যদি অভিমান করে লুকিয়ে থাকে, কানাইয়ের ডাকে ঠিক ছুটে আসবে সিদ্ধেশ্বর, ঠিক ছুটে আসবে।

পত্র হস্তে ভানুসিংহের প্রবেশ।

ভানুসিংহ। আসবে না দাদা, তার হাতে পায়ে লোহার শৃঙ্খল!

মুকুটসিংহ। [সবিস্ময়ে] ভানু!

ভানুসিংহ। সত্যি দাদা। আমাদের আদরের দুলালী আজ দুর্দ্দান্ত ডাকাত কৈজুদ্দিনের বন্দিনী!

সিদ্ধেশ্বর। }
মুকুটসিংহ। } বন্দিনী!

ভানুসিংহ। হ্যাঁ। সামান্য ডাকাত, যাকে নখে টিপে মারতে পারি, সেও আজ চিঠি লিখে চোখ রাঙিয়েছে।

মুকুটসিংহ। কি লিখেছে পড়ত ভানু?

ভানুসিংহ। এই নিন দাদা! [পত্রদান]

মুকুটসিংহ। [পত্রপাঠান্তে চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল] বটে! এত স্পর্দ্ধা ছোটলোক ডাকাতের?

সিদ্ধেশ্বর। কি লিখেছে মহারাজ? ডাকাতটা কি লিখেছে?

মুকুটসিংহ। লিখেছে, যদি হরিপুরের বিদ্রোহী প্রজাদের দাবী মেনে নিই, আমার আদরিণী কন্যা সাধনাকে ছেড়ে দেবে, নইলে সারাজীবন তাকে ডাকাতের বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে।

সিদ্ধেশ্বর। উঃ! এত স্পর্দ্ধা ছোটলোক ব্যাটাদের?

ভানুসিংহ। হরিপুরের বিদ্রোহী প্রজারাই ষড়যন্ত্র করে সাধনাকে চুরি করিয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর। পত্রের মর্ম্মে তাই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু চারিদিকে প্রহরী-বেষ্টিত দুর্গ থেকে ডাকাতরা রাজকুমারীকে হরণ করে নিয়ে গেল কোন পথে?

ভানুসিংহ। মনে হয়, সাধনা একা দুর্গের বাইরে গিয়েছিল।

মুকুটসিংহ। না—না, তা সে যায়নি। দুর্গরক্ষীরা বলেছে, কাল সারাদিন তাকে দুর্গের বাইরে যেতে দেখেনি।

ভানুসিংহ। দুর্গের মধ্য থেকে ডাকাতরা সাধনাকে ধরে নিয়ে গেল, অথচ কারও চোখে পড়লো না?

সিদ্ধেশ্বর। সেটাই ত আশ্চর্য্যের কথা ছোটরাজা! এ যে ভেল্কী বলে মনে হচ্ছে।

ভানুসিংহ। ও বাহাদুরী আমি বন্দুকের নলে উড়িয়ে দেব। আদেশ দাও দাদা, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পদ্মনগর পরগনার চারিদিকে ঘাঁটি তৈরী করি। একবার যখন রাজধানীতে হানা দিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই আবার অন্য কোথাও হানা দেবে।

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু রাজকুমারীর কি হবে?

ভানুসিংহ। ডাকাতরা ধরা পড়লেই সাধনাকে উদ্ধার করা যাবে।

সিদ্ধেশ্বর। কতদিনে ধরা পড়বে? যদি একমাস দেরী হয়, তাহলে —

ভানুসিংহ। তাহলে?

সিদ্ধেশ্বর। ছোটলোক ডাকাত, তাদের বিশ্বাস কি? যদি রাজকুমারীর উপর নির্যাতন করে,—তাহলে নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষায় রাজকন্যা নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবেন।

মুকুটসিংহ। [চমকিত হইয়া] না—না, তার শোক আমি সইতে পারবো না। যাও ভানু, আমার আভিজাত্য পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে হরিপুরের বিদ্রোহী প্রজাদের দাবী মিটিয়ে আমার আদরিণী কন্যাকে ফিরিয়ে আন!

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদামিনী। না মহারাজ! আদরিণী কন্যা যুগ যুগ ডাকাতের বন্দিনী হয়ে থাক, তুমি হরিপুর বিদ্রোহ দমন করতে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে এখুনি রওনা হও দেবর!

মুকুটসিংহ। সৌদামিনী! তুমি না তার মা।

সৌদামিনী। তার চেয়ে গৌরবের পরিচয় আমি পদ্মনগরের রাণী, লক্ষ লক্ষ প্রজাদের সুখ-দুখের অংশভাগি।

সিদ্ধেশ্বর। মুসলমান ডাকাতের ঘরে আপনার মেয়ে রয়েছেন মহারাণী!

সৌদামিনী। মেয়ের চেয়ে বড় আমার স্বামী-শ্বশুরের আভিজাত্য।

একটা মেয়ের জন্য সে আভিজাত্য পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে, নীচ ডাকাতের ভয়ে হরিপুরের বিদ্রোহী প্রজাদের দাবী মেনে নিলে, পদ্মনগর রাজবংশের নামে কলংকপাত হবে সিদ্ধেশ্বর।

মুকুটসিংহ। কিন্তু সাধনা যদি ডাকাতের হাতে নারীত্বের মর্য্যাদা রাখতে আত্মহত্যা করে?

সৌদামিনী। আমি তার প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে প্রতি প্রভাতে চোখের জলে তার আত্মার শান্তি কামনা করব।

ভানুসিংহ। এই ত সত্যিকারের মা, এই ত পদ্মনগর পরগণার মহারাণীর উপযুক্ত কথা। অসার মায়া ত্যাগ করে প্রকৃত শাসকের চোখ নিয়ে চেয়ে দেখ দাদা! তোমার ওপরই নির্ভর করছে লক্ষ লক্ষ প্রজাদের মানমর্য্যাদা। ডাকাত ফৈজুদ্দিনের ভয়ে আজ যদি হরিপুরের বিদ্রোহী প্রজাদের দাবী মেনে নাও, কাল তারা অন্য গ্রামের প্রজাদের উত্তেজিত করে আরও বেশী দাবী জানাবে। না—না, তা হতে পারে না। সাধনা মরুক, তবু অক্ষুণ্ণ থাক আমাদের আভিজাত্য।

মুকুটসিংহ। আভিজাত্য—আভিজাত্য—আভিজাত্য! যুগের দাবীতে আভিজাত্যের সৌধ ভেঙ্গে পড়তে চাইছে, তবু সবল হাতে তাকে ধরে রাখতে হবে। স্নেহের পুত্তলি সাধনা হয়ত ডাকাতের ঘরে বাবা বাবা বলে চীৎকার করে কাঁদছে, তার কুসুম কোমল সোনার অঙ্গে হয়ত পশুর দল নির্য্যাতন করছে, হয়ত কৌমার্য্যের মর্য্যাদা রাখতে ধর্ম্মপরায়না মা আমার ঘরের দোরে মাথা ঠুকে রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। না—না, আর ভাবতে পাচ্ছি না। ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাব।

সৌদামিনী। কাপুরুষের মত তুমি বিদ্রোহী প্রজাদের দাবী

মেনে নেবে রাজা! কাল যদি ছোটলোক ডাকাতরা তোমার সাধনার মেছে কলংকের ছাপ মেরে পথে ছেড়ে দেয়, তখন কি করবে রাজা? স্নেহের বশে তখনও কি কলংকিনী কন্যাকে আদর করে ঘরে তুলে নেবে?

মুকুটসিংহ। সৌদামিনি!

সৌদামিনী। মানুষের বুকে যারা ছুরি বসিয়ে দেয়, তাদের প্রতিশ্রুতির মূল্য কি রাজা? সাধনার কথা ভুলে যাও মহারাজ! মনে কর ডাকাতরা তাকে হত্যা করেছে।

মুকুটসিংহ। হত্যা করেছে?

সৌদামিনী। মনে কর, মৃত্যুর পূর্ব্বে সে কাতর কণ্ঠে নিষ্ঠুর ডাকাতদের পায়ে ধরে মুক্তি চেয়েছিল, কিন্তু সেই কাকুতি দুপায়ে দলে পিশে তার সোনার অঙ্গে কলংকের কালি মাখিয়ে দিয়েছে। তাই ধর্ম্মপরায়ণা মা আমার লোহার কপাটে মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা হয়েছে। আর চীৎকার করে বলছে, প্রতিশোধ নিও বাবা—প্রতিশোধ নিও।

মুকুটসিংহ। প্রতিশোধ--প্রতিশোধ! হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি প্রতিশোধ নেবো, কঠোর প্রতিশোধ নেবো। হরিপুরের বিদ্রোহ দমন আপাততঃ বন্ধ থাক সিদ্ধেশ্বর। আমার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে সেই ডাকাতদের আগে দমন করতে হবে। যাও ভানুসিংহ, পদ্মনগর পরগনার দিকে দিকে ছাউনি ফেলে সৈন্য মোতায়েন কর! আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে ডাকাত কৈজুদ্দিন আর তার দল বলকে ধরে এনে আমার সামনে হাজির করা চাই। এতদিন রাজা মুকুটসিংহকে তারা দেখেছে শুধু কঠোর শাসক, এবার দেখবে তাকে জীবন্ত শয়তান। যারা আমার আদরের কন্যাকে ধরে নিয়ে

গিয়ে কলংকিনী করেছে, তাদের সারবন্দী করে দাঁড় করিয়ে একটার পর একটা করে গায়ের মাংস কেটে নেবে, আর সেই ক্ষতস্থানে লবণ ছিটিয়ে দেবে। মৃত্যু যন্ত্রণায় তারা আর্তনাদ করবে, আর আমি বুকফাটা তৃপ্তির হাসি হেসে ভগবানকে কাঁপিয়ে তুলব।

[সিদ্ধেশ্বর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাজীমাৎ। তোমার ঘরের ঢেঁকী কুমীর হয়েছে রাজা—বাইরের লাফালাফি বৃথা।

[প্রস্থান।

—:•:—

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

মাণিক পোদ্দারের বাড়ি।

মাণিক ও ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। কোন কথা শুনব না। ক্যাবলার হীরে বসান কবচটা আজই দিতে হবে। আমার মধুসূদনের হাতের মাপে একটা সোনার পাত তৈরী করিয়ে রেখেছি। বাছার আজ জন্মতিথি, সেই পাতে হীরে বসানো কবচটা এঁটে হাতে পরিয়ে দিয়ে পাঁচ ব্যঞ্জন আর পিঠে পায়েস খাওয়াব।

মাণিক। পাঁচ ব্যঞ্জন কেন? পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আর পিঠে পায়েস খাইয়ে তোমার আদরের ছেলের জন্মতিথি পালন কর, তাতে আমার দুঃখ নেই গিন্নি। কিন্তু ওই হীরে বসানো কবচটার নাম মুখেও এনো না!

ভবানী। কেন? ওই হীরে বসানো কবচ পরার যুগ্যি ছেলে আমার মধুসূদন নয়?

মাণিক। আরে, রামবলো। সে কথা কি আর এই পাপমুখে বলতে পারি? ছেলে বলে ছেলে, যেন বেউর বাঁশের তেউড়।

ভবানী। কি বল্লে? আমার ছেলে বেউর বাঁশের তেউড়? বাছার জন্মদিনে এমন অলক্ষুণে কথা?

মাণিক। অলক্ষুণে হলো কিসে গিন্নি? বলি, ছেলে তোমার

এ বয়সে যা ডেঁপো হয়েছে, তাতে বারো বছর কারাগারে থেকে পাথর ভাঙ্গবে, আর ডালরুটি খাবে।

ভবানী। ও মাগো! বাছার জন্মদিনে এ অলপ্পেয়ে মিনসে কি সব অলক্ষুণে কথা বলে গো! আমি মাথা খুঁড়ে মরবো নাকি!

মাণিক। মাথা খুঁড়ে মর, তাতে ক্ষতি নেই গিন্নি। শুধু আমার আর ওচোর ভাত তরকারি রান্না করে দিও!

ভবানী। ঝাঁটা মারি ওচোর মাথায়। ওচোর সোহাগে উনি গলে পড়ছেন। ভাত তরকারি রান্না করে দেব? ওই ওচোকে যদি আজই বাড়ী থেকে না তাড়াও, তাহলে দুজনের পাতেই উনুনের ছাই বেড়ে দেবো।

মাণিক। উনুনের ছাই আমাদের পাতে বেড়ে দিলে তোমার আদরের দুলালকে নিয়ে আজই গঙ্গাযাত্রা করতে হবে গিন্নী! এখন ওচোকে দুচোখে দেখতে পারবো না, কিন্তু যখন ওই অকালকুষ্মাণ্ড মোদো হয়নি, তখন তো ওচোই তোমার গলার মালা ছিল গিন্নি।

ভবানী। যখন ছিল, তখন ছিল। বলি, এক গাছের ছাল কি আর একগাছে জোড়া লাগে? যতই 'ওচো ওচো' কর, যেদিন ওর চোখ ফুটবে, সেইদিনই তোমার সোহাগে লাথি মেরে ড্যাং ড্যাঙিয়ে চলে যাবে।

মাণিক। ভগবান করুন যেন ওর চোখ ফুটে যায়। তোমার নাক নাড়া আর মুখ সিট্‌কানো দেখে ছেলেটাকে কত বলি, ওরে পালা—পালা, তুই এখান থেকে পালিয়ে যা। কিন্তু বাছা আমার ব্যোম ভোলানাথ, হেনেস্তা, গালাগালি, অপমান গ্রাহ্যই করে না।

ভবানী। তাই কখনো করে? খাটতে হয় না, দিব্যি বসে বসে ভাতের পাহাড় গিলছে, যাবে কেন?

মাণিক। ও কথা বলো না গিন্নি! মাথায় বজ্রাঘাত হবে। ওচো খাটে না? মেলায় মেলায় যে সোনার গহনা নিয়ে যাই, সেতো ওরই ভরসায়। একটা মুটে কি একটা দারোয়ানও সঙ্গে নিতে দেয় না। বলে মিছিমিছি বাজে খরচ করে কি হবে বাবা? আমি মাথায় করে গহনার পেটি নিয়ে যাচ্ছি, আর তোমার আশীর্ব্বাদে চোর ডাকাত ঘেঁসতে পারবে না।

ভবানী। আহা-হা মরে যাইরে! ছেলেটা খেটে খেটে সারা হয়ে যাচ্ছে।

মাণিক। যাচ্ছেই ত! ভারী ভারী গয়নার পেটি মাথায় নিয়ে পাঁচ-সাত ক্রোশ পথ হাঁটা কি মুখের কথা গিন্নি? কই, তোমার বাছাধন ত একদিন হাট-বাজার করে দেয় না?

ভবানী। কেন দেবে? বলি কেন দেবে? ও ত আর পথে পড়ে থাকা নষ্ট মেয়েমানুষের গর্ভে জন্মায়নি। ভাগ্যবান ছেলে আমার পেটে জন্মেছে।

মাণিক। তাই পাঁটা হয়েছে গিন্নী, তাই বোকা পাঁটা হয়েছে।

ভবানী। কি! আমার মধুসূদন বোকা-পাঁটা?

ধনুর্ব্বাণ ও তীরভর্ত্তি তূণ হাতে মধুসূদনের প্রবেশ।

মধুসূদন। দাও মাগো সন্তানে বিদায়!
চলে যাব ধনু হাতে
রক্তারক্তি কাণ্ড করিবারে।

তোমার সন্তান হয়ে অপমান
নাহি সব মাতা।
চাহিয়াছ ক্যাবলা দাদার
হীরের কবচ,
জন্মদিনে পরাইতে মোরে।
তার তরে জানোয়ার বাবা
মোরে বলে কুবচন
তোমার সকাশে?

মাণিক। শুনচো—শুনচো রত্নগর্ভা? তোমার হীরের টুকরো ছেলে কেমন যাত্রার ঢঙে বক্তৃতা করে বাপকে জানোয়ার বলচে, শুনচো?

ভবানী। আহা, তা আর শুনিনি? আমার মধুসূদন যে এত চমৎকার বক্তৃতা দিতে শিখেছে তা তো জানতুম না। আজ যদি বাছা আমার বচন সরকা অধিকারীর দলে যেত, তাহলে সাতগণ্ডা টাকা মাইনে পেত।

মাণিক। তাই যাক গিন্নী, তাই যাক্। ও ব্যাটা যাত্রাদলে গিয়ে পাকাপাকি আস্তানা নিক, নইলে বছর খানেকের মধ্যেই রাজকারাগারে ঢুকে পড়বে।

মধুসূদন। ওঃ! নাহি সহে এই অপমান।
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মাতা,
রাখিতে তোমার মান
চলিলাম ধনুহাতে রাজদ্বারে
সৈনিকের চাকরি কারণ।
চাকরি লয়ে সেনাপতি পাশে
আবার আসিব ফিরে।

গর্দ্দভ পিতারে মোর শাস্তি দিতে
সুতীক্ষ্ণ শায়কে।

[কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপদের হাঁটু ভাঙ্গিয়া বসিয়া ধনুতে শর যোজনা করিয়া মাণিকের দিকে ধরিল।]

ভবানী। ওকি করছিস যাদু, ওকি করছিস? তীরটা ছুটে গেলে তোর বাপের বুকে বিঁধে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

মধুসূদন। [উঠিয়া] এ-হে-হে-হে, তুমি কিচ্ছু জান না মা, কিচ্ছু জান না! সত্যি সত্যিই কি আমি তীরটা ছেড়ে দিচ্ছি? বক্তৃতা করে এই রকম হাঁটু গেড়ে বসে পোজ দেখাতে পারলেই হাজার হাজার শ্রোতা চড়চড় করে হাততালি দেবে।

সহসা অচিন্ত্যা আসিয়া মধুসূদনের কান ধরিল।

অচিন্ত্যা। তার আগেই আমি তোর কান ছিঁড়ে ফেলব হতভাগা বাঁদর! আমার তীর ধনুক নিয়ে মা বাবার সামনে এসে যাত্রার ঢঙে বক্তৃতা করছিস?

ভবানী। কি! আমার মধুসূদনের কানে হাত?

মধুসূদন। বিচার কর মা—বিচার কর! ক্যাবলা দাদার তীর ধনুক নিয়ে এসে না হয় তোমাদের বক্তৃতা শুনিয়ে যাত্রার প্যাঁচ দেখিয়েছি, তাবলে আমার অপমান?

ভবানী। বলি, এত তেজ কিসের রে ক্যাবলা? আছিস ত পরের অন্নদাস হয়ে।

অচিন্ত্যা। মা!

ভবানী। যার অন্ন খাচ্ছিস, তারই বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছিস বেইমান?

অচিন্ত্য। আমি বেইমান নই মা। কিন্তু জানো ত, তীর-ধনুক আমার জীবনের চেয়ে বড়? মধুর সব অত্যাচার আমি সইতে পারি, কিন্তু যার সঙ্গে জীবনের অস্তিত্ব মিশিয়ে দিয়েছি, সেই তীর-ধনুকের অপমান আমি সইতে পারব না মা।

মাণিক। সইতে হবে বাবা! যতদিন আমার পাপ সংসারের অন্ন খাবি, ততদিন তোকে এ কালসাপের দংশন সইতে হবে বাবা।

অচিন্ত্য। বাবা!

মাণিক। যা—যা, সোনারচাঁদ তুই চলে যা। বড় হয়েছিস, দশজনের একজন হয়েছিস, কিছু না মিললেও রাজার সৈন্যবিভাগ তোকে চাকরি দেবে।

অচিন্ত্য। চাকরির আশা আমি করিনি বাবা! দুটো পেটের ভাত মিলিয়ে নেবার যোগ্যতা আমার আছে। কিন্তু—

মাণিক। কিন্তু?

অচিন্ত্য। তোমার স্নেহপাশ ছেড়ে চলে যেতে মন যে চায় না বাবা!

মাণিক। এ স্নেহপাশ ছিঁড়ে তোকে যেতেই হবে ওরে! তোর বিরহ যন্ত্রণার চেয়ে আমার বেশী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই হেনস্তা। ওরে, এই কালনাগিনী তোকে নিজের ছেলের মত মানুষ করে কি করে যে ছোবল মারে, তা ত বুঝতে পারি না।

ভবানী। কি? আমি কালনাগিনী?

অচিন্ত্য। না মা! তুমি দেবী!

মাণিক। মনকে চোখ ঠারিস্‌নি বাবা। ও যে কত বড় পাষাণী, তা তুই মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিস্! যা—যা, তুই চলে যা বাবা, তাতে আমি শান্তি পাবো।

অচিন্ত্য। তুমি যদি শান্তি পাও বাবা, আর আমার আপত্তি করা চলে না। আমি এখুনি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

মাণিক। দাঁড়া! যাবার সময় কিছু টাকা কড়ি নিয়ে যা।

অচিন্ত্য। দরকার নেই বাবা! তোমার আশীর্ব্বাদই আমার পাথেয়।

মাণিক। তাহলে তোর হীরে বসানো কবচটা নিয়ে যা।

অচিন্ত্য। তোমার অচিন্ত্যর শেষ স্মৃতি ওই হীরে বসানো কবচটা রেখে দাও বাবা!

মাণিক। সেকি! ওটা যে তোরই সম্পত্তি। যেদিন তোকে কুড়িয়ে পাই, সেদিন যে ওটা তোর হাতেই বাঁধা ছিল রে ওচো। আজ যাবার সময় নিজের ধন নিয়ে যা।

অচিন্ত্য। ও ধন সেদিন কোথায় থাকত বাবা, যদি মায়াবশে ঘরে না নিয়ে আসতে? পরিত্যক্ত অসহায় শিশু আমি, চীৎকার করে বনভূমি কাঁপিয়ে তুলছিলুম, কেউ ত আসেনি আমার পিপাসিত কণ্ঠে একবিন্দু জল দিতে। যত অমূল্য সম্পদই হোক্, ও হীরের কবচ আমার কাছে মূল্যহীন বাবা।

মাণিক। পথ থেকে তুলে এনে মানুষ করেছি, আদর করে অচিন্ত্য নাম রেখেছি; দেখছি নাম রাখা আমার সার্থক হয়েছে। যা বাবা, চলে যা এই সাপের গর্ত্ত ছেড়ে। আশীর্ব্বাদ করি, তুই রাজার মত সুখী হ'।

অচিন্ত্য। এই ত অমূল্য সম্পদ দিলে বাবা? পায়ের ধুলো দাও। [প্রণাম করিল] আশীর্ব্বাদ কর, যেন মানুষের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি।

মাণিক। বেঁচে থাক বাবা! সুখী হ', মানুষ হ'!

অচিন্ত্য। তুমিও পায়ের ধুলো দাও মা! [প্রণাম করিল] আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার জীবনের ব্রত পূর্ণ হয়।

মাণিক। চুপ করে আছো কেন গিন্নী? তোমার ইচ্ছে ত পূর্ণ হয়েছে। ছেলেটা চলে যাচ্ছে, এক মুহূর্ত্ত মা হয়ে আশীর্ব্বাদ কর।

ভবানী। আশীর্ব্বাদের জোরে তুমি ত সোহাগের ছেলেকে একেবারে রাজা করে দিয়েছ, ওর ওপর আমি আর কি আশীর্ব্বাদ করবো?

মাণিক। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার অচিন্ত্য—না না, তোমার মুখে আশীর্ব্বাদের ভাষা আসবে না। চল বাবা, তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

অচিন্ত্য। আর একটু দাঁড়াও বাবা! এখনো ভাই মধুসূদনের কাছে বিদায় নেওয়া হয়নি।

মধুসূদন। আমার কাছে আর বিদায় নিতে হবে না—বিদায় নিতে হবে না। আমি মধুসূদন—স্বয়ং ভগবান! তোমাকে দস্তুরমত আশীর্ব্বাদ করে ছেড়ে দিলে আর রক্ষে থাকবে না। [ডান হাত তুলিয়া] আশীর্ব্বাদং শিরশ্ছেদং গয়াগঙ্গা বারাণসী, পথের ভাত কুড়িয়ে খেয়ে ধরুক তোমায় যক্ষা কাশী।

মাণিক। তোকে জন্ম জন্ম যক্ষ্মা কাশী ধরুক্ ওঁয়োটা! মুখে রক্ত উঠে মর তুই—মর—মর! আমি তোকে পুড়িয়ে এসে শান্তিজল নেবো হতভাগা।

[অচিন্ত্যকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

ভবানী। বটেরে অলপ্পেয়ে মিনসে! আমার বাছার জন্মদিনে

এমন সর্ব্বনেশে কথা! দাঁড়াও; আজ তোমায় গোবরজল ছড়া দিয়ে ঘরের বার করবো।

মধুসূদন। সেই ভাল মা, সেই ভাল। ওই বুড়ো জানোয়ার বাবাটাকে গোবর জল ছড়া দিয়ে ঘরের বার করে, সিন্দুকের টাকা-কড়ি নিয়ে আমি দুহাত ভরে মেঠাই-মোণ্ডা খাব আর গান-বাজনা করব।

[উভয়ের প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৈমুদ্দিনের গুপ্তকক্ষ।

চোখ বাঁধা সাধনাকে লইয়া আব্বাসউদ্দিনের প্রবেশ।

সাধনা। এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে?

আব্বাসউদ্দিন। ডাকাত ভায়ের ঘরে। [সাধনার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিল।]

সাধনা। [চারিদিকে চাহিয়া] উঃ! কি অন্ধকার!

আব্বাসউদ্দিন। মাটির নীচে ঘর, তাই এত অন্ধকার।

সাধনা। মাটির নীচে ঘর? ও, ধরা পড়বার ভয়ে এখানেই লুকিয়ে থাকো!

আব্বাসউদ্দিন। না। ডাকাতির ধন-রত্ন এখানে লুকিয়ে রাখা হয়।

সাধনা। তাহলে আমাকে এখানে আনলে কেন?

আব্বাসউদ্দিন। তুমিও যে ডাকাতির সম্পদ।

সাধনা। তাহলে আজীবন আমায় এই অন্ধকার ঘরে আটক থাকতে হবে?

আব্বাসউদ্দিন। না। তোমার বাবাকে পত্র দিয়েছি, হরিপুরের প্রজাদের দাবী মেনে নিলেই আমি নিজে গিয়ে তোমাকে রেখে আসবো।

সাধনা। বাবা, তোমাদের দাবী মিটিয়ে দিলে তুমি নিজে গিয়ে আমাকে রেখে আসবে, এত সাহস তোমার?

আব্বাসউদ্দিন। জনসেবার জন্ম যারা ডাকাতি করে, তাদের সাহসও যেমন, বুদ্ধিও তেমনি।

সাধনা। আমাকে পৌছে দিতে গেলে যদি ধরা পড়ে যাও?

আব্বাসউদ্দিন। তাহলে তুমিই আমাকে মুক্তি দেবে।

সাধনা। আমি!

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ! বোনের কাছে ভায়ের আব্দার বেশী।

সাধনা। ডাকাতিই যাদের পেশা, তাদের ভাই বলে রাজকুমারী সাধনা কখনও স্বীকার করে না।

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দাকিনী। তাহলে রাজকুমারীকেও বোনের মর্যাদা দিয়ে রাখবে না, রাখবে একটা পথে পড়ে থাকা ভিখারিণীর মত।

সাধনা। এ কে?

আব্বাসউদ্দিন। বহিন্!

সাধনা। বুঝেছি। ডাকাত ভায়ের বোন যা হয়—

মন্দাকিনী। ডাকাত ভায়ের বোন কি হয় রাজকন্যা?

সাধনা। উচ্ছৃঙ্খল—চরিত্রহীনা।

ফৈজুদ্দিনের প্রবেশ।

ফৈজুদ্দিন। হুঁসিয়ার! ও কথা আবার উচ্চারণ করলে জিভটাই ছিঁড়ে নেব রাজকন্যা!

মন্দাকিনী। বলতে দাও—বলতে দাও বাবা! উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন যাদের পেশা, তারাই দুনিয়ার মানুষের চরিত্র কলুষিত দেখে।

সাধনা। সাবধান নারি! আভিজাত বংশোদ্ভব রাজনন্দিনী আমি, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন আমাদের পেশা নয়।

মন্দাকিনী। কেমন করে বিশ্বাস করব? তোমার মত আভিজাত্য গরবিনী মেয়েরাই ত দেখতে পাই পুরুষদের হাত ধরে সান্ধ্য বায়ু সেবনে নির্জনে নদীর ধারে বেড়াতে যায়। গোপনে উদ্যান বিহার করে। প্রেক্ষাগৃহে নাচ-গান হাসি তামাসা দেখে। আর অভিভাবকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে বলে, প্রগতি-শীল যুগের এটাই রীতি।

ফৈজুদ্দিন। ঝাড়ু মারি আমি প্রগতিশীল যুগের মাথায়। মাতৃ-জাতিই যদি বিষিয়ে যায় তাহলে দেশের গর্ব্ব করার আর বাকি রইলো কি?

সাধনা। ছোটলোক ডাকাত তোমরা, আভিজাত বংশের মেয়েদের মনের খবর রাখবে কেমন করে? প্রগতিশীল যুগের মেয়েরা আর পুরুষের পায়ের নীচে পড়ে থাকবে না, সমান অধিকার আদায় করে নেবে।

ফৈজুদ্দিন। নইলে নটীদের সঙ্গে পাল্লা দেবে কেমন করে? পুরুষরা সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে নটীদের গান শুনে মদ খেয়ে ফূর্ত্তি

করে বেড়িয়েছে, এইবার মেয়েরা পুরুষ নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করে দুনিয়াটাকে জাহান্নামে পাঠাবে।

সাধনা। সাবধান ছোটলোক ডাকাত!

আব্বাসউদ্দিন। আমরা ছোটলোক, কিন্তু লম্পট নই। রাজবাড়ীর বাগান থেকে দুজনে এক ঘোড়ায় এসেছি, কিন্তু কোন অসম্মান করেছি?

সাধনা। করনি নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে।

আব্বাসউদ্দিন। কি উদ্দেশ্য?

সাধনা। যে উদ্দেশ্যে আমাকে ধরে এনেছ—সেই হরিপুরের প্রজাদের দাবী আদায় করা। আমি বাবাকে অনুরোধ করে তোমাদের দাবী মিটিয়ে দোব বলেই তোমরা আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছ।

মন্দাকিনী। হরিপুর প্রজাদের দাবী মিটিয়ে দিলেই ত মুক্তি পাবে রাজকন্যা!

সাধনা। মুক্তি যে পাব তার প্রমাণ? যদি কার্য্যোদ্ধারের পর আমার নারীত্বের অসম্মান করে?

মন্দাকিনী। উনিশ বছর এসেছি, শুধু বাপ আর ভায়ের স্নেহ ছাড়া অন্য কোন দুর্ব্যবহার পাইনি রাজকন্যা!

সাধনা। উনিশ বছর এসেছ! তাহলে তুমি ডাকাত সর্দ্দারের মেয়ে নও?

কৈমুদ্দিন। নিজের মেয়েই হয়ে গেছে বহিন্। এই উনিশ বছরে মা আমার এমন কঠিন মায়ায় ফেলেছে—যাক, সে কথা আর ভাবতে পারি না। [চোখে জল আসিল]

সাধনা। উনিশ বছর তুমি এই ডাকাতের আড্ডায় পড়ে আছ কেন?

মন্দাকিনী। কেন? [চক্ষুদ্বয় জলিয়া উঠিল] সে কথা মনে হলে প্রতিহিংসা রাক্ষসীটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। উনিশ বছর আগের এক উৎসব মুখরিত রাত্রে প্রাসাদ ছেড়ে শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে স্বামীর হাত ধরে পথে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু সেই পথে পেয়েছি শুধু নির্য্যাতন

সাধনা। নির্য্যাতন!

মন্দাকিনী। হ্যাঁ। আর কে সেই অত্যাচারী জানো?

সাধনা। কে?

মন্দাকিনী। দেশের রাজা?

কৈফুদ্দিন। যে দেশে মানুষের অধিকার নাই, শ্রমিক ভাই-বোনেরা কঠোর পরিশ্রম করেও অনাহারে বিনাচিকিৎসায় মরে, আর ধনীর ঘরে চলে আনন্দ উৎসব। এই মজ্জাগত রোগটা তাড়াতেই আজ আমরা ডাকাত, এই নিয়ম বদলে দিয়ে সকলের সমান অধিকার দিতেই আমরা শক্তির সাধনা করছি।

সাধনা। তোমাদের আশা পূর্ণ হবে না।

কৈফুদ্দিন। হবে না?

সাধনা। না। সকলের সমান অধিকার নিয়ে পাশাপাশি বাস করবার মত সাহস এখনো দেশবাসীর হয়নি।

কৈফুদ্দিন। সে ত রাজশক্তিরই দোষ বহিন্। চোখে ঠুলি দিয়ে অসহায় মানুষগুলোকে গরুর মত খাটিয়ে নিলে দেশবাসীর মন গড়ে উঠে না। দেশে স্কুল খুলে বিনা বেতনে উচ্চশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে কি? লাখ লাখ টাকা খরচ করে শুধু মেলা বসিয়ে বড় বড় কুমড়ো আর রাঙা আলুর পাহাড় বানাবার শিক্ষা দিলেই শিক্ষা হবে না। শিক্ষা পেয়ে ভদ্রলোক যদি মাঠে নেমে এসে ধান রুয়ে দেখাতে পারে তাহলেই হবে সুশিক্ষা।

আব্বাসউদ্দিন। রাজপুরুষেরা সে শিক্ষা দেবে না বাপজান! কাঁটা গাছের জঙ্গলে দেশ ভরে গেছে, গোড়াশুদ্ধ উপড়ে ফেলে সুধাফলের গাছ ফলাতে পারলে তবেই দেশের মানুষ বাঁচবে।

সাধনা। ভগবান যাকে মারে, মানুষ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

ফৈজুদ্দিন। না পারি সবাই একসঙ্গে মরব। তবু চেষ্টা ছাড়ব না। আব্বাস, বহিন্‌কে এক সপ্তাহ এই ঘরে আটক করে রাখ, যদি রাজা আমাদের দাবী মেটায় ভাল, না মেটায় এখান থেকে নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ীতে রেখে দেব।

সাধনা। তোমাদের বাড়ী!

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ রাজকুমারী! সবুজ পাইন গাছে ঘেরা ছোট্ট মেটে ঘর। গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা এসে তারই দাওয়ায় বসে আমার বহিনের কাছে পড়াশুনা করে।

সাধনা। সেখানে আমি থাকবো কার কাছে?

মন্দাকিনী। আমার কাছেই থাকবে। দু'জনে মিলে রান্না-বান্না করব, সংসারের কাজ-কর্ম দেখবো, বাগানে শাক-সব্জী ফলাবো।

সাধনা। তুমি হিন্দু না মুসলমান?

মন্দাকিনী। আমি মানুষ।

সাধনা। কিন্তু জাতিতে তুমি কি?

ফৈজুদ্দিন। যদি মুসলমান হয়?

সাধনা। তাহলে ওর ছোঁয়া খাব না।

ফৈজুদ্দিন। খাবারে যাদের জাত মিশে থাকে, তাদের না খেয়ে মরাই ভাল। মানুষকে ঘৃণা করে কেউ বড় হতে পারে না বহিন্! হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান, সবাই এক খোদার সৃষ্টি। যারা

জাতিভেদ করবে, তাদের মাথায় সেই দীনছুনিয়ার মালিকের অভিশাপ ঝরে পড়বে।

[প্রস্থান।

আব্বাসউদ্দিন। ডাকাত কৈজুদ্দিন দীন-দুঃখীর দরদী বন্ধু! তার ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন পূজোও করে না, নামাজও পড়ে না। শুধু মানুষের সেবাতেই তারা ঈশ্বরের আরাধনা করে।

[প্রস্থান।

মন্দাকিনী। ঈশ্বরের অফুরন্ত করুণাই এদের উপর ঝরে পড়ে রাজকন্যা! ভালবাসা দিয়ে এরা মানুষের মন জয় করে। কিছুদিন থাকলে তার প্রমাণ তুমিও পাবে। এখন এস, ওই পাশের কুটিরীতে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। চিন্তা নেই, আমার হাতের রান্না খেলে তোমার জাত যাবে না। আমি হিন্দুর মেয়ে।

সাধনা। হিন্দুর মেয়ে! তোমার পরিচয়?

মন্দাকিনী। আমি ডাকাত কৈজুদ্দিনের ধর্ম্ম-মেয়ে, এ ছাড়া অন্য পরিচয় দেব না।

সাধনা। আবার কবে দেখা হবে?

মন্দাকিনী। সাতদিনের মধ্যে আর দেখা পাবে না।

সাধনা। তাহলে?

মন্দাকিনী। হিন্দুর ছেলে-মেয়েরাই তোমার সেবা করবে, আমার দেখা পাবে সাতদিন পরে ডাকাত বাগজানের সবুজ পাইন গাছে ঘেরা ছোট্ট পাতার কুটীরে।

[সাধনা সহ প্রস্থান।

—:•:—

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

কথা বলিতে বলিতে ভানুসিংহ ও সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

ভানুসিংহ। পদ্মনগরের চারিদিকে সৈন্য মোতায়েন করেছি, তবু ডাকাতরা ধরা পড়ছে না।

সিদ্ধেশ্বর। ডাকাতরা কৌশলে কাজ হাসিল করছে ছোটরাজা! পদ্মনগর পরগণার চারিদিকে সৈন্য মোতায়েন রয়েছে, অথচ প্রতি-দিনই একটা না একটা গ্রামে ডাকাতি হচ্ছে।

ভানুসিংহ। এটা আশ্চর্য্যের বিষয় সিদ্ধেশ্বর! শালুকপুর হাটের পাশে ঘাঁটি করে দুশো সৈন্য মজুদ রাখলুম, নিয়মিত তারা পাহারাও দিচ্ছে, অথচ শালুকপুর হাটেই ডাকাতি হয়ে গেল।

সিদ্ধেশ্বর। কৈফুদ্দিন কৌশলে রাজশক্তির অক্ষমতা প্রমাণ করতে এই রকম সামনাসামনি ডাকাতি করছে।

ভানুসিংহ। আচ্ছা, কদিন এ রকম ডাকাতি চালাবে? ভিখিরী সাজো সেজে নিশ্চয়ই আমাদের চোখে ধূলো দিচ্ছে। তুমি বিরাজপুরের ঘাঁটিতে থাক সিদ্ধেশ্বর! ভিখারী দেখলেই ভাল করে পরীক্ষা করবে, তার কাছে অস্ত্র-শস্ত্র আছে কিনা।

সিদ্ধেশ্বর। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ছোটরাজা, সিদ্ধেশ্বর শর্ম্মার চোখ এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা কোন ডাকাতের হবে না। যতই ছদ্মবেশে আসুক ঠিক ধরে ফেলব।

ভানুসিংহ। তা যদি পারো, তাহলে লোহার শেকল হাতে পায়ে পরিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। মারের চোটে ওদের আড্ডার সন্ধান বার করে নেব।

সিদ্ধেশ্বর। একটাকে ধরতে পারলেই দলের সন্ধান বার করা যাবে। হাঁ, তাহলে আপনি আজ কোন্ ঘাঁটিতে যাবেন ছোটরাজা? শালুকপুরে?

ভানুসিংহ। না, এই ঘাঁটিতেই থাকব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সিদ্ধেশ্বর। পথে বেড়াবেন, না তাঁবুতে বিশ্রাম করবেন?

ভানুসিংহ। তাঁবুতে বিশ্রাম করবো, দরকার হলে পথেও বেরোব।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। পথে বেরিয়ে এলে প্রাণ বাঁচবে, কিন্তু তাঁবুতে থাকলে—

কৈলাসের প্রবেশ।

কৈলাস। কি গো দেওয়ানমশাই, বিরাজপুরের পথে? ডাকাত ধরতে নাকি?

সিদ্ধেশ্বর। কি আর করি বল্, যার নুন খাই তার কাছে নিজেকে খাঁটি রাখতে হবে ত।

কৈলাস। ও শয়তানের ভাত না খাওয়াই ভাল।

সিদ্ধেশ্বর। একেই বলে চাষার বুদ্ধি। গোঁয়ার্তুমি করে কেবল মারধোর খাচ্ছিস, কিছু কাজ এগিয়েছে? কিন্তু শয়তানের ভাত খেয়ে সিদ্ধেশ্বর এমন পাকা শয়তান হয়েছে যে একচালে বাজীমাৎ করে এসেছে।

আব্বাসউদ্দিনের প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। এত শীগ্‌গির বাজীমাৎ হবে না দেওয়ানমশাই, এত শীগ্‌গির হবে না।

সিদ্ধেশ্বর। একি, ছদ্মবেশ না পরেই—

আব্বাসউদ্দিন। পথে বেরিয়ে কোন ভুল করিনি। কৈজুদ্দিন আর তার ব্যাটা আব্বাসের নামই লোকে শুনেছে, তাদের স্বরূপ কখনও দেখেনি।

সিদ্ধেশ্বর। ওদিকের খবর? রাজকুমারী—

আব্বাসউদ্দিন। তার বাপকে অনুরোধ করে চিঠি লিখ্‌তে রাজী হয় নি।

সিদ্ধেশ্বর। এদিকের খবরও তাই। এরা ডাকাত ধরে শাস্তি দেবে, তাই চারিদিকে ঘাঁটি করেছে।

আব্বাসউদ্দিন। তাই ত আবার আপনার কাছেই ফিরে এলুম দেওয়ান মশাই! রাজাকে আমরা প্যাঁচে ফেলে দোব, কিন্তু সর্ব্ব-বিষয়ে আপনাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে।

সিদ্ধেশ্বর। নিশ্চিন্ত থাক। দেওয়ান সিদ্ধেশ্বর তার প্রভুকে সর্ব্বহারা করার প্রতিশোধে এই পদ্মনগর রাজবংশটাকে ধ্বংস করতে পেছপাও হবে না।

ঘাঁটিদার। [নেপথ্যে] হো ঘাঁটি সামলানেওয়ালা ভাই-লোক,— ঘাঁটি সামালো! হুষমন! হুষমন!

সিদ্ধেশ্বর। সরে যাও—সরে যাও, শীগ্‌গির সরে যাও। ঘাঁটিদার সৈন্য হাঁক দিয়েছে।

আব্বাসউদ্দিন। কৈলাস, আমি মাঝি সেজে নিচ্চি, তুই সাধি গান গাইতে গাইতে আমায় হাত ধরে চল।

[কৈলাসের মুখে একটি দাড়ি পরাইয়া মাথায় গামছা বাঁধিয়া দিল, একটি ঝোলার মধ্য হইতে নৌকার হালের তক্তা বাহির করিয়া লাঠির মাথায় বাঁধিতে লাগিল।]

কৈলাস। গীত।

ওরে, ও ভাই নূতন নেয়ে।
কোন্ মুলুকে যাস চলে আজ তোর ছোট্ট লাঠি বেয়ে।
কালো জলে বেজায় তুফান,
ওরে বইতে হবে তোরে উজান,
ছাড়্‌বারে তুই ভব দুনিয়ার টান নইলে মরবি চুবন খেয়ে।
ভবের হাটে আমরা হাটি,—
বেচা কেনার আখের মাটি,
এখন পারে যেতে বাড়িয়ে পাটি আয় না মাঝি না নিয়ে।

[গাহিতে গাহিতে উভয়ে মাঝির ছদ্মবেশে চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বর। মাঝি চলেছে, কর্ম্মঠ বুদ্ধিমান মাঝি চলেছে। কর্ম্ম-সাগরে যতই তুফান উঠুক, ঠিক সাফল্যের কূলে পৌঁছবে।

[প্রস্থান।

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। ভাত চাই—খাবার চাই। দু'দিন কিছু খাইনি। খিদেয় পেট জ্বলছে, মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখছি। কি আশ্চর্য্য! একজন গ্রামবাসীরও দোর খোলা নেই যে কিছু ভিক্ষে চাইব। ওঃ—ভগবান! উনিশ বছর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি না খেয়ে মরব? না—না, তা হবে না। আমাকে বাঁচতেই হবে, যেমন করেই হোক বাঁচতে হবে।

ভানুসিংহ। [নেপথ্যে] অন্ধকারে পথ দেখা যাচ্ছে না। কে—কে ওখানে ?

ভবানন্দ। কে—কে কথা কইলে ? ভগবান—ভগবান, তুমি আছ ? ক্ষুধার্ত্ত হয়ে তোমাকে ডেকেছিলুম, তাই কি আমার ক্ষুধায় আহার্য্য পাঠিয়ে দিয়েছ ?

ভানুসিংহের প্রবেশ।

ভানুসিংহ। কে—কে ?

ভবানন্দ। দু'দিন খেতে পাইনি। আমাকে কিছু খেতে দিয়ে বাঁচাও ভাই।

ভানুসিংহ। অন্ধকারে চিনতে পারছি না, পরিচয় দাও, কে তুমি ?

ভবানন্দ। আমি ভিখারী।

ভানুসিংহ। ভিখারী !

ভবানন্দ। হাঁা বাবা ! দাও—দাও ! কিছু খেতে দাও।

ভানুসিংহ। খেতে দোব ? ব্যাটা ডাকাত ! ভেবেছিস ছেঁদো কথায় ভুলে যাব ? চল্—চল্ আমাদের শিবিরে।

ভবানন্দ। কি বলছো বাবা ? আমি ডাকাত ?

ভানুসিংহ। নিশ্চয়। কাল দলবল নিয়ে শালুকপুরের হাটে ডাকাতি করেছিস্, আজ আবার এসেছিস্ ভিখারী সেজে আমাদের চোখে ধুলো দিতে ? চল্—চল্ শিবিরে, মারতে মারতে তোদের আড্ডার খবর বার করে তবে আজ ভানুসিংহ জলগ্রহণ করবে।

ভবানন্দ। ভানুসিংহ ? কোন্ ভানুসিংহ—কোন্ ভানুসিংহ ?

ভানুসিংহ। পদ্মনগর পরগণার রাজা মুকুটসিংহের ভাই—

ভবানন্দ। [উত্তেজিত ভাবে] রাজা মুকুটসিংহের ভাই ! উঃ,

ভগবান—ভগবান, একবার আমায় দশটা হাতির বল দাও; আমি ওই অত্যাচারী রাজবংশের মাথা পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিই।

ভানুসিংহ। তার আগেই তোর শাস্তি নে ছোটলোক। [লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল ও বার বার কশাঘাত করিতে লাগিল।]

ভবানন্দ। ওঃ ভগবান! দেখ—দেখ, ক্ষুধাতুর অভাগার উপর কি নির্য্যাতন!

ভানুসিংহ। ভগবান অবিচারী নন। তাই ছোটলোক ডাকাতদের শাস্তি তিনি হাসিমুখেই দেখেন, আর আশীর্ব্বাদ করেন সুবিচারী শাস্তিদাতাদের! চল্-চল্ আমাদের শিবিরে, নইলে জ্যান্তে গায়ের চামড়া তুলে নোব।

[ভানুসিংহ বলিতেছিল, ওদিকে মাঝিবেশে আব্বাসউদ্দিন
পিছন হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া ভানুসিংহের
কোষবদ্ধ তরবারি তুলিয়া লইল, ও কটিদেশ
হইতে পিস্তল লইয়া ভানুসিংহের মাথায়
ঠেকাইয়া ধরিল।]

আব্বাসউদ্দিন। তার আগে তোমার মাথাটা উড়ে যাবে ছোটরাজা!

ভানুসিংহ। কে—কে? [ঘুরিতে গেল]

আব্বাসউদ্দিন। ঘোরবার চেষ্টা করো না। বুঝতে পারছ, তোমার মাথার পেছনে পিস্তলের নল ঠেকানো আছে।

ভানুসিংহ। [তরবারি ও পিস্তল ধরিতে গিয়া বুঝিল নাই] একি! আমার তরবারি আর পিস্তল?

আব্বাসউদ্দিন। হাঃ হাঃ-হাঃ! ডাকাত ধরবে বলে বড় আশায় গুলি ভরে রেখেছিলে, কিন্তু খোদা সেই গুলিভরা পিস্তলে তোমার মাথাটাই উড়িয়ে দিতে চান।

ভবানন্দ। দাও—দাও, ওর মাথাটাই উড়িয়ে দাও! দেশের দীন-দুঃখী অনাথ আতুরের উপর যে নির্য্যাতন করে, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

আব্বাসউদ্দিন। তা কি হয়? মেরে ফেলে যে আমাদেরই হার হবে। যাও—যাও, তুমি পালিয়ে যাও।

ভবানন্দ। পালিয়ে যাব!

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ—হ্যাঁ। ভিখারীর জায়গা এ দেশে নেই। মানুষের মত যদি বাঁচতে চাও, তাহলে ডাকাত কৈজুদ্দিনের কাছে ফিরে যাও।

ভবানন্দ। সেই ভাল। শহরে, গ্রামে, সর্ব্বত্রই এক অবস্থা, পল্লীতে গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষে চাইলেও মেলে না। বড়লোকেরা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। না খেয়ে মরার চেয়ে ডাকাতের আশ্রয় নেওয়া অনেক ভাল—অনেক ভাল।

[প্রস্থান।

আব্বাসউদ্দিন। কি করতে চাও ভানুসিংহ? প্রজাদের দাবী মেটাবে, না বন্দী হয়ে ডাকাতের কেল্লায় যাবে?

ভানুসিংহ। আমি কিছুই করবো না, শুধু সমানে পাল্লা দিয়ে চলবো। [বসিয়া পড়িল ও আব্বাসউদ্দিনের পিস্তল ধরা হাত ধরিল, উভয়ের কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলিল।] কে আছ ঘাঁটিদার, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও।

অচিন্ত্য। [নেপথ্যে] ভয় নেই—ভয় নেই আমি শব্দ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছি। [সহসা একটি তীর আসিয়া আব্বাসের দক্ষিণ হস্ত বিদ্ধ করিল, ও তাহার হাত হইতে পিস্তল পড়িয়া গেল।]

আব্বাসউদ্দিন। উঃ! কে রে?

ভানুসিংহ। তোর যম। [পিস্তল কুড়াইতে গেল, কিন্তু তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বামহস্তে পিস্তল কুড়াইয়া আব্বাসউদ্দিন পলাইয়া গেল] কে আছ! ডাকাত পালিয়ে যায়, ধর ধর।

তীর ধনুক হস্তে দ্রুত অচিন্ত্যর প্রবেশ।

অচিন্ত্য। কোনদিকে গেল, কোনদিকে গেল ?

ভানুসিংহ। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, ওকে আর ধরা যাবে না।

অচিন্ত্য। আপনার টাকা-কড়ি, সোনা-দানা সব লুঠ করে নিয়ে গেল ?

ভানুসিংহ। না। এক কপর্দকও নিতে পারে নি।

অচিন্ত্য। যাক্। নিশ্চিন্ত।

ভানুসিংহ। কে তুমি যুবক, দেবদূতের মত উদয় হয়ে আমায় বিপদ মুক্ত করলে ?

অচিন্ত্য। আমি পথের ছেলে, আমার সঙ্গী এই তীরভরা তূণ আর ধনুক।

ভানুসিংহ। তোমার বাপ-মা কেউ নেই ?

অচিন্ত্য। বাপ-মা আছে কিনা জানি না। তবে এইমাত্র জানি পথের ছেলে আমি, মানুষ হয়েছি পদ্মনগর রাজধানীর এক স্বর্ণকারের ঘরে।

ভানুসিংহ। পদ্মনগরের প্রজা তুমি, তার উপর আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। বল, কি চাও ? সোনা-দানা, টাকা-কড়ি, হীরে-জহরৎ, বাড়ী-ঘর।

অচিন্ত্য। কিছুই চাই না।

ভানুসিংহ। ইতস্ততঃ করো না ? মনে রেখো, আমি পদ্মনগরের

রাজা মুকুট সিংহের ভাই। টাকা-কড়ি, সোনা-দানা, হীরে-জহরৎ অথবা যে কোন উচ্চপদ। যা চাইবে—তাই পাবে।

অচিন্ত্য। পথের ছেলে আমি, পথই আমার ঘর। কিছু দিতে হবে না রাজভ্রাতা! ডাকাতের হাত থেকে আপনার জীবন রক্ষা করতে পেরেছি, এই যথেষ্ট।

ভানুসিংহ। [সবিস্ময়ে] সেকি! আমি দেবো, তবু তুমি নেবে না?

অচিন্ত্য। না।

ভানুসিংহ। এখনো চিন্তা করে দেখ, চাইলে বাড়ী ঘর পাবে, টাকাকড়ি পাবে, দারিদ্রতা ঘুচে যাবে।

অচিন্ত্য। ভগবান যাকে বঞ্চিত করেছে, তার দুঃখ কেউ ঘোচাতে পারে না!

ভানুসিংহ। তবে যাও বীর, আজীবন আমি তোমার উপকারের কথা স্মরণ করবো। যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় রাজপ্রাসাদে যেও, তোমার জন্ত চিরদিন দোর খোলা থাকবে। মনে রেখো, ভানুসিংহ যমের চেয়ে নির্দয়; কিন্তু তোমার কাছে সে শুধু স্নেহের ভাই।

[প্রস্থান।

অচিন্ত্য। এত মহৎ।

আব্বাসউদ্দিনের পুনঃ প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। এ মহত্ব মনের নয়—মুখের!

অচিন্ত্য। কে তুমি?

আব্বাসউদ্দিন। শয়তানের দুষমন।

অচিন্ত্য। ওকি, তোমার হাত থেকে রক্ত পড়ছে কেন?

আব্বাসউদ্দিন। তোমার ছোঁড়া তীর বিঁধে এই রক্তপাত।

অচিন্ত্য। তাহলে তুমিই—

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ, ডাকাত আব্বাসউদ্দিন।

অচিন্ত্য। ডাকাত আব্বাসউদ্দিন তুমি!

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ, দেশবিখ্যাত ডাকাত গরীবের দরদী বন্ধু। ভানুসিংহের চীৎকারে দূর থেকে তীর ছুঁড়ে তুমি বহুৎ গরীব চাষীর ক্ষতি করেছ। যাক্, আজ রেহাই পেলেও জেদ ওদের রাখবো না। কিন্তু এমন তীরন্দাজ হয়ে তুমি পথে পথে ঘুরছো কেন?

অচিন্ত্য। পথই আমার ঘর।

আব্বাসউদ্দিন। তাও শুনেছি, আর ভানুসিংহের দান অগ্রাহ্য করেছ দেখে শ্রদ্ধায় মনটা ভরে উঠেছে। তোমার নির্লোভ চরিত্রের পরিচয় আমি পেয়েছি যুবক। এস, আমার সঙ্গে—

অচিন্ত্য। ডাকাতের আড্ডায়?

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ।

অচিন্ত্য। মানুষ মেরে তোমরা সোনা-দানা, টাকা-কড়ি, লুঠ করে নাও—

আব্বাসউদ্দিন। গরীব ভাই-বোনদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে। আমরা ডাকাত, কিন্তু ডাকাতির অর্থে করি জনসেবা।

অচিন্ত্য। একি সত্য?

আব্বাসউদ্দিন। বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে চল, দেখে আসবে।

অচিন্ত্য। তাই চল। বিলাসের প্রাসাদে আমি ঠাঁই চাই না। যদি তোমার কথা সত্য হয়, থাকবো তোমাদের ঘরে। সারা

জগৎ তোমাদের ডাকাত বলে ঘৃণা করলেও আমার কাছে পাবে দেবতার মর্য্যাদা।

আব্বাসউদ্দিন। তবে এস মহান যুবক, এস বন্ধু, এস নির্ভীক মানুষ, তোমার ডাকাত ভাইয়ের ঘরে। পরিচয়হীন পথের ছেলে বলে সারা দুনিয়া তোমায় উপেক্ষা করলেও, ডাকাত আব্বাসউদ্দিন চিরদিন বেঁধে রাখবে তোমায় তার বাহুর বন্ধনে।

[অচিন্ত্যকে লইয়া প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

পদ্মনগর—রাজপ্রাসাদ।

উত্তেজিত মুকুটসিংহ, ভানুসিংহ ও সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

মুকুটসিংহ। ছেড়ে দিলে? হাতে পেয়েও দুর্দান্ত ডাকাতটাকে ছেড়ে দিলে কাপুরুষ?

ভানুসিংহ। ভানুসিংহ কাপুরুষ নয় দাদা। ডাকাতরা যে অবস্থায় আমাকে ফেলেছিল, তাতে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি।

সিদ্ধেশ্বর। সত্য মহারাজ! তীরন্দাজ ছেলেটা যদি তীর মেরে ডাকাতটাকে কাবু না করতো, তাহলে হয় আপনার ভাইকে হারাতেন, নয় হরিপুর জমিদারী বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে চলে যেতো।

মুকুটসিংহ। ভাইয়ের মৃত্যু-শোক সইতে হতো! কেন? আমার সৈন্যরা কি পরাজিত হয়েছিল?

সিদ্ধেশ্বর। যুদ্ধই হলো না, তার আবার হারজিৎ। ভিখিরীটাকে ডাকাত মনে করে ছোটরাজা ঠ্যাঙাচ্ছিলেন, এমন সময় ডাকাতটা পেছন থেকে এসে ওঁর তলোয়ার আর পিস্তল তুলে নিলে।

মুকুটসিংহ। আশ্চর্য্য! শত শত সুশিক্ষিত সৈন্যের সতর্কদৃষ্টি এড়িয়ে ডাকাতটা ভানুর তলোয়ার আর পিস্তল তুলে নিলে? আর একটা তীরন্দাজ ছেলে দূর থেকে তীর মেরে তাকে কাবু করে দিলে, তবুও সে নিরাপদে চলে গেল?

সিদ্ধেশ্বর। মনে হয়, আমাদের সেনাপতিদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস-ঘাতকতা করে ডাকাতদের এই সুযোগ করে দিয়েছে রাজা। নইলে বারবার নাকের ডগায় ঝামা ঘষে দিয়ে ওরা পালাচ্ছে, আর আমরা কিছু করতে পাচ্ছি না, শুধু ছড়া নাকেই হাত বুলোচ্ছি।

মুকুটসিংহ। তোমার কথা যদি সত্য হয় সিদ্ধেশ্বর, তাহলে রাজশক্তির গর্ব্ব বৃথা।

সিদ্ধেশ্বর। এমনি যদি চলতে থাকে, তাহলে হরিপুরের সঙ্গে রামপুর শ্যামপুর অনেক গ্রামই যাওয়ার পথে দাঁড়াবে মহারাজ।

ভানুসিংহ। না—না, ভানুসিংহ বেঁচে থাকতে তা হবে না। একবার হেরে গেলেও, আবার আমি চেষ্টা করব। হয় ডাকাতদের মারব, না হয় নিজে মরব।

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদামিনী। তুচ্ছ ডাকাতদলের কাছে পরাজয় স্বীকার করে কলংকিত মুখে ফিরে আসার চেয়ে মৃত্যুই ভাল ছিল।

সিদ্ধেশ্বর। মরব বল্লেই ত মৃত্যু হয় না মা! আর শক্তির প্রতিযোগিতা হলোই বা কখন, যে হার-জিতের প্রশ্ন তুলছেন?

ভানুসিংহ। আর তা হবে না সিদ্ধেশ্বর! এবার যদি ডাকাতদের হাতে নাও মরি, আত্মহত্যা করে এ মর্ম্মান্তিক লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেবো।

মুকুটসিংহ। তোকে মরতে হবে না ভানু! বার বার ডাকাতদের কাছে পরাজিত হয়ে সবার চেয়ে বেশী লজ্জা আমার। মরতে যদি হয়, সবার আগে আমি মরব।

ভানুসিংহ। দাদা!

মুকুটসিংহ। আজই আমি ডাকাত দমনে যাব ভানু! যে মুকুটসিংহের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, বিদেশী রাজারা যাঁর ভয়ে থর থর করে কাঁপে, আজ তারই রাজ্যে প্রজা-বিদ্রোহ, তারই রাজ্যে ডাকাতের অত্যাচার—

প্রজাগণ। [নেপথ্যে] কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর। ডাকাত—ডাকাত—

মুকুটসিংহ। ও কাদের চীৎকার?

ভানুসিংহ। আমি দেখে আসছি দাদা!

[দ্রুত প্রস্থান।

প্রজাগণ। [নেপথ্যে] মহারাজ কই? মহারাজ কই?

ভানুসিংহের প্রবেশ।

ভানুসিংহ। পদ্মনগর রাজধানীর ব্যবসায়ীরা রাজপ্রাসাদের সামনে অপেক্ষা কচ্ছে, তারা আপনার দর্শন চায়।

মুকুটসিংহ। কি বলতে চায়?

সিদ্ধেশ্বর। নিশ্চয়ই ডাকাতির প্রতিকার চাইছে।

ভানুসিংহ। সত্য দাদা। কাল রাত্রে ডাকাতরা চারজন ব্যবসায়ীকে হত্যা করেছে, দশ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করেছে, অথচ নগররক্ষীরা কিছুই জানলে না।

সিদ্ধেশ্বর। না জানবারই কথা। আমি ত আগেই বলেছি মহারাজ, নিশ্চয়ই রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

মুকুটসিংহ। সংবাদ নাও, গোপনে সংবাদ নাও সিদ্ধেশ্বর! আমার কর্ম্মচারীদের মধ্যে কে সেই বিশ্বাসঘাতক। যদি উপযুক্ত প্রমাণসহ তাকে আমার কাছে হাজির করতে পার, তাহলে হরিপুর জমিদারীর অর্দ্ধাংশ আমি তোমাকেই দান করব।

সিদ্ধেশ্বর। হরিপুরের জমিদারীর আশা এ দাস করে না মহারাজ! আপনার কৃপাদৃষ্টির নীচে আমৃত্যু চাকরি করতে পেলে এ দাস কৃতার্থ হবে।

ভানুসিংহ। রাজধানীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি, কি করবেন দাদা?

সৌদামিনী। কি আর করবে? সামনে গিয়ে বলে এস, সাত দিনের মধ্যে ডাকাতি বন্ধ করা হবে।

সিদ্ধেশ্বর। প্রতিশ্রুতি দেবার দরকার নেই মা! যদি সাতদিনের মধ্যে ডাকাত দমন করতে না পারেন?

সৌদামিনী। না পারেন, দরবারের সামনে সেনাপতি সৈন্যাধ্যক্ষদের নিয়ে জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে এই চরণনের কলংকের হাত থেকে অব্যাহতি নেবেন। আমি সিঁথির-সিঁদুর হাতের নোয়া সেই আগুনে ফেলে দিয়ে অস্ত্র হাতে যাব ডাকাত দমনে।

পত্র হস্তে রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। সেলাম হুজুর। চিঠি।

ভানুসিংহ। [পত্র লইয়া] তুই যা রক্ষী। [রক্ষীর প্রস্থান] [পত্র পাঠান্তে] সর্ব্বনাশ!

মুকুটসিংহ।
সৌদামিনী। } কি হয়েছে—কি হয়েছে?

ভানুসিংহ। [বিবর্ণ মুখে] কানাই কোথায় গিয়েছিল বৌদি?

সৌদামিনী। কেন—কেন?

ভানুসিংহ। ডাকাতরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

সকলে। সর্ব্বনাশ!

সৌদামিনী। দিনের আলোয় হাজার হাজার নগরবাসীর সামনে ডাকাতরা আমার সোনারচাঁদ ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল!

সিদ্ধেশ্বর। না--না, এ কখনও হতে পারে না! এ নিশ্চয়ই ডাকাতদের ধাপ্পা।

ভানুসিংহ। ধাপ্পা নয় সিদ্ধেশ্বর। এই দেখ, চিঠিতে লিখেছে; রাজা, তোমার একমাত্র ছেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। যদি তিনদিনের মধ্যে আমাদের দাবী মেটাও, তাহলে ছেলেমেয়ে ফিরে পাবে। নইলে ছেলের কাটা মাথা উপহার পাবে, আর মেয়ের কাছে পাবে বিবাহের নিমন্ত্রণ।

মুকুটসিংহ। ওঃ! এতবড় অপমান! এ আঘাত আমি সইতে পারব না রাণী, সইতে পারব না।

সৌদামিনী। বিচলিত হলে চলবে না রাজা। পাঠাক তারা আমার একমাত্র ছেলের ছিন্নমুণ্ড, তবু আভিজাত্যের মাথায় পদাঘাত করে ডাকাতদের দাবী আমি মেনে নিতে পারব না।

ভানুসিংহ। বৌদি!

সৌদামিনী। মা হয়ে আমি যদি পুত্র-কন্যার শোক সইতে পারি, তুমি কেন পারবে না দেবর? দু'বার ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এসেছ, এইবার নিশ্চয়ই সফল হবে। আবার যাও তুমি, তারা যদি কুমারী মেয়ের ধর্ম্ম নষ্ট আর অবোধ শিশুকে হত্যা করে, তাহলে নিশ্চয়ই জেনো, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ওদের জীবন দিতে হবে।

প্রজাগণ। [নেপথ্যে] কই, রাজা কই? আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

মুকুটসিংহ। আভিজাত্যের লোহার কপাটে মাথা ঠুকে ওরা রক্তাক্ত হয়, তবু সংস্কারের মেরুদণ্ড নুয়ে পড়ে না, কপাটও খোলে না। ধনীর প্রাসাদ আর দরিদ্রের কুঁড়ে ঘর পাশাপাশি থাকতে চায়, কিন্তু স্বার্থের প্রবল ঝড় সে পথে বাধা স্বরূপ। চল ভানু, আমরাও ছুটে যাই শাসনের কশা হাতে নিয়ে; সাফল্যের তীরে যদি পৌঁছতে পারি ভাল, আর যদি না পারি সকলে একসঙ্গে যুগের হাওয়ায় তরী ভাসিয়ে দেব।

[ভানুসিংহ সহ প্রস্থান।

সৌদামিনী। যুগের হাওয়ায় তোমরা তরী ভাসিয়ে দিলেও আমি যাব না রাজা! মুছে যাক আমার সিঁথির সিঁদুর, ঘুচে যাক আমার সাধনার নাম, মৃত্যু হক আমার একমাত্র পুত্রের, তবু অক্ষয় হয়ে থাক খড়্গবংশের আভিজাত্য। [প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! যুগের দাবীতে তোমার আভিজাত্যের গর্ব্ব ধুলোয় মিশে যাবে দাম্ভিক রমণী!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ফৈজুদ্দিনের কুটীর পার্শ্বস্থিত উদ্যান।

অচিন্ত্যের প্রবেশ।

অচিন্ত্য। যত দেখছি, ততই আশ্চর্য্য হচ্ছি। ডাকাতির টাকায় এরা পাঠশালা খুলেছে, দাতব্য চিকিৎসালয় করেছে, দরিদ্র ভাণ্ডার বসিয়েছে, কারখানা খুলেছে। এত মহৎ এরা, তবে ডাকাতি করে কেন?

আব্বাসউদ্দিনের প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। টাকার প্রয়োজনে।

অচিন্ত্য। ডাকাতি না করেও ত টাকা রোজগার করা যায়।

আব্বাসউদ্দিন। যায়। কিন্তু যা প্রয়োজন অন্য পথে তত টাকা আসে না।

অচিন্ত্য। এই ঘৃণ্য পথে আর কতদিন টাকা জোগাড় করবে?

আব্বাসউদ্দিন। যতদিন না গরীব ভায়েরা স্বাবলম্বি হয়। যাক্, তোমার কথা বল।

অচিন্ত্য। আমি এখানে থাকব জনসেবা করতে।

আব্বাসউদ্দিন। বেশ।

অচিন্ত্য। কিন্তু একটা সর্ত্ত।

আব্বাসউদ্দিন। বল।

অচিন্ত্য। ডাকাতির কাজে আমি তোমাদের কোন সাহায্য করব না।

আব্বাসউদ্দিন। আপত্তি নেই।

অচিন্ত্য। কোনদিন যদি ওই ঘৃণ্য পন্থা গ্রহণের দাবী কর, তাহলে আমি চলে যাব।

আব্বাসউদ্দিন। ডাকাত ফৈজুদ্দিনের ঘরে একবার যে প্রবেশ করে, তার যাওয়ার পথ চিররুদ্ধ।

অচিন্ত্য। তাহলে কি বুঝব আমি বন্দী?

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ।

অচিন্ত্য। [সক্রোধে] মিথ্যাবাদী প্রতারক!

আব্বাসউদ্দিন। হাঃ-হাঃ হাঃ! আমি দাদা আর তুমি ভাই!

অচিন্ত্য। আমাকে যেতে দাও।

আব্বাসউদ্দিন। না। তোমার মত জোয়ান ভাইকে ছেড়ে দিলে, আমাদের কাজ পিছিয়ে যাবে।

সাধনার প্রবেশ।

সাধনা। তোমাদের কাজের মাথায় বজ্রাঘাত হক।

অচিন্ত্য। এ কি! তু—তু—তুমি?

সাধনা। [সবিস্ময়ে] তু—মি?

আব্বাসউদ্দিন। জনসেবার ব্রত নিয়ে এসেছে ডাকাত ভাইয়ের ঘরে।

সাধনা। কিন্তু—

আব্বাসউদ্দিন। এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। ও এসেছে স্বেচ্ছায়, আর তোমাকে—

সাধনা। জোর করে ধরে এনেছ নির্যাতন করতে।

অচিন্ত্য। সে কি! নারী নির্য্যাতন!

আব্বাসউদ্দিন। নির্য্যাতন নয়, আভিজাত্য গরবিনী নারীর ভ্রম সংশোধন করতে। সাতদিন তোমাকে এনেছি। ভগবানের নামে শপথ করে বল, কেউ তোমার অসম্মান করেছে?

সাধনা। না। কিন্তু—

আব্বাসউদ্দিন। খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, কোন বিষয়ে কি কিছু অসুবিধা হচ্ছে?

সাধনা। না।

আব্বাসউদ্দিন। শুনলে?

অচিন্ত্য। কিন্তু তোমরা ওকে ধরে এনেছ কেন?

আব্বাসউদ্দিন। সে কৈফিয়ৎ দেব না। যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও?

অচিন্ত্য। বল?

আব্বাসউদ্দিন। এ কুমারীকে তুমি চেনো?

অচিন্ত্য। মনে হচ্ছে, দেওয়ালী মেলায় বুনোবরার হাত থেকে ওকে বাঁচিয়েছিলুম।

আব্বাসউদ্দিন: তবে আর প্রশ্ন নয়, এস আমার সঙ্গে।

সাধনা। মাটির নীচ থেকে আমাকে তুলে এনেছ, এখন আমি থাকব কোথায়?

আব্বাসউদ্দিন। বলেছি ত বহিনের কাছে থাকবে।

সাধনা। তার কাছে থাকব না। আমাকে মাটির নীচে সেই বদ্ধ ঘরে পাঠিয়ে দাও।

আব্বাসউদ্দিন। বেশ, চল।

অচিন্ত্য। যাবার সময় তোমার দেওয়া হীরের আংটিটা নিয়ে যাও।

সাধনা। না। ওটা যে আমার স্মৃতি।

আব্বাসউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। তোমার মনের আঁধার ঘরে কার তসবীর লুকিয়ে রেখেছ তার সন্ধান এই যুবক না পেলেও বুড়ো আব্বাসউদ্দিন পেয়েছে। মাটির নীচে স্যাঁতসেঁতে ঘরে আর তোমায় থাকতে হবে না। এই বাগানের ছোট্টো পাতার ঘরে থাকবে তুমি সবুজ ঘাসের সঙ্গে তোমার সবুজ মনের কামনা মিলিয়ে দিতে।

সাধনা। এই বাগানে আমি একা থাকব?

আব্বাসউদ্দিন। না—না, সঙ্গে থাকবে তোমার আঁখির রোশনাই এই [illegible] যুবক।

অচিন্ত্য। [সবিস্ময়ে] আমি?

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ! ভবিষ্যতে তুমি যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তার পরীক্ষা করতে এই কুমারীকে পাহারা দেবার ভার দিলুম। মনে রেখো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই পাবে জনসেবার ভার।

অচিন্ত্য। একি শাস্তি? নির্জন বাগানে—

সাধনা। একা থাকতে ভয় হচ্ছে?

অচিন্ত্য। ভয় কাকে বলে জানি না। কিন্তু জনসেবার ব্রত নিয়ে ডাকাতের আড্ডায় এসে কুমারী মেয়ের পাহারাদার হয়ে থাকতে হবে কেন?

সাধনা। এতে তোমার লাভ না হলেও আর একজনের লাভ হবে।

অচিন্ত্য। লাভ হবে?

সাধনা। হ্যাঁ। পরে জানতে পারবে। এখন চল, ওই ছোট্ট পাতার কুটীরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফৈজুদ্দিন ও মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দাকিনী। এলো না? এত গর্ব্ব তার?

ফৈজুদ্দিন। গর্ব্ব হবে বৈকি মা, ও যে রাজকন্যা।

মন্দাকিনী। [চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল] রাজকন্যা। আভিজাত্য গরবিনী রাজার মেয়ে! ও গর্ব্ব খর্ব্ব করে দিতে এখুনি যদি ঘুমন্ত রাক্ষসীটাকে জাগিয়ে তুলি?

ফৈজুদ্দিন। মা! মা!

মন্দাকিনী। অনেক চেষ্টায় ঘুম পাড়িয়েছিলুম। কিন্তু দিলে না, —ওই দাম্ভিকা মেয়েটা ঘুমুতে দিলে না। ওর আভিজাত্যের বিষাক্ত বাতাস ঝড়ের বেগে বয়ে যাচ্ছে, তাই সে জেগে উঠতে চায়, তাই সে হত্যার বিভীষিকা ফুটিয়ে তুলতে চায়।

ফৈজুদ্দিন। মা মা, একি মূর্ত্তি তোর? করুণার ধারা ঝরে পড়ে যে চোখে, সেখানে কেন দোজাকের আগুন, খোদার দোয়া নেমে আসে যে মুখে, সেই মুখে কেন খুনের নেশা। যে হাতে তাদের দুঃখ ভুলিয়ে দিস মা, সে হাতে কেন তুলতে চাস হত্যার ছোরা? থামা বেটী, থামা তোর সর্ব্বনাশী প্রতিহিংসার ঝোড়া।

গীতকণ্ঠে কানাইসিংহের প্রবেশ।

কানাইসিংহ। গীত।

ফিরে চল—ফিরে চল ওগো ফিরে চল মোর হাসিভরা ঘরে।
সেথা মা আমার জাগে মরণের নীড়ে বাধা বেঁধে শোকে চাহিবারে।

তারা ডাকে উত্তরায় কানাই কানাই,
ওগো আমি যে তাদের বুকে আর নাই,
এ দুঃখ কাহারে বলগো কানাই ঘুমাই কার বুকের পরে॥

মন্দাকিনী। কে তুই অবোধ শিশু, প্রতিহিংসাময়ী রাক্ষসীর সামনে ছুটে এলি?

কৈজুদ্দিন। ও তোর আর একটা ছেলে মা। নে—নে, ওকে বুকে তুলে নে।

কানাইসিংহ। না—না, আমি আর কারো বুকে যাব না। ওগো তোমরা আমাকে ধরে এনেছ, আমাকে দেখতে না পেয়ে আমার বাবা মা কত কাঁদছে! কেঁদে কেঁদে হয়তো চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেছে। দাও, আমাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দাও।

মন্দাকিনী। কে—কে তোর বাবা? কার ঘর আলো করা সোনার চাঁদ তুই?

কানাইসিংহ। আমার বাবা—পদ্মনগরের রাজা।

মন্দাকিনী। [উত্তেজিতভাবে] মুকুটসিংহ।

কৈজুদ্দিন। মা—মা!

মন্দাকিনী। নিদ্রিত রাক্ষসীটা এবার রক্ত পিপাসায় মেতে উঠল বাবা, আর তার গতিরোধ করতে পারবে না। [ছোরা বাহির করিয়া] তবে শয়তান মুকুটসিংহের পুত্র, তোর পিতার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে—[ছোরা তুলিল]

কৈজুদ্দিন। [বাধা দিয়া] ছোরা নামা মা—ছোরা নামা! ওরে মা, মুকুটসিংহের অপরাধের শাস্তি তার ছেলেকে দিস নি!

কানাইসিংহ। না না, আমাকে মেরো না—আমাকে মেরো না তুমি। আমি কোন অপরাধ করি নি।

মন্দাকিনী। তুই অপরাধ না করলেও তোর পিতার অপরাধের শেষ নেই। আমার সোনার সংসার ভেঙ্গে দিয়ে আমাকে পথের ভিখারী করেও তার তৃপ্তি হয় নি। আমার শেষ সম্বলটুকুও সে লুণ্ঠন করিয়েছে। আমাকে স্বামীর পদসেবা থেকে বঞ্চিত করেছে। শিশু সন্তান—ওঃ। না—না, হবে না, তার ছেলের পরিত্রাণ হবে না। আমাকে সর্ব্বহারা করার অপরাধে আমিও তাকে পুত্রহারা করব। [পুনরায় হত্যায় উদ্যত]

ফৈজুদ্দিন। মা—মা!

মন্দাকিনী। সরে যাও—সরে যাও বাবা! আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে দাও।

কানাইসিংহ। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে মেরে ফেলো না। আমার মত তোমারও ত ছেলে আছে, তাকে কি তুমি মেরে ফেলতে পারবে?

মন্দাকিনী। আমার ছেলে?

কানাইসিংহ। হ্যাঁ, আমিও সেই ছেলে। মনে কর, আমিও তোমার সেই ছেলে—তুমি আমার সেই মা!

মন্দাকিনী। মা!

ফৈজুদ্দিন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মা!

কানাইসিংহ। মা—মা!

মন্দাকিনী। [কাঁপিতে কাঁপিতে ছোরা পড়িয়া গেল] বুকে আয়—ওরে শিশু বুকে আয়, আমি মা, আমি যে সন্তানের মা!

[কানাইকে বক্ষে ধারণ ও নেপথ্যে কামান গর্জ্জন।]

ফৈজুদ্দিন। }
মন্দাকিনী। } ওকি! ওকি!

আব্বাসউদ্দিনের প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। জঙ্গল ঘেরাও করে রাজা মুকুটসিংহ নিজে কামান দাগছে।

মন্দাকিনী। শয়তান আবার এসেছে আমার সোনার সংসার ভেঙে দিতে। চল্—চল্, ওরে পথের ছেলে, তোকে লুকিয়ে রাখব আমার স্নেহ-স্বর্গে। [কানাইসিংহ সহ প্রস্থান।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে মুকুটসিংহের জয়ধ্বনি ও ঘন ঘন কামানগর্জ্জন।]

আব্বাসউদ্দিন। ওই—ওই শয়তানরা ঘন ঘন কামান দাগছে, ওই মুকুটসিংহের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলে ওরা এগিয়ে আসছে।

কৈজুদ্দিন। ওদের এগিয়ে আসতে দে ব্যাটা, ওদের এগিয়ে আসতে দে। আমাদের হাতিয়ার নেই, আছে বুদ্ধি আর লড়াইয়ের বুদ্ধি। সেই সম্বল নিয়েই আজ আমরা মুকুটসিংহকে ঘায়েল করব। চল্—চল্, ডাকাত ভাইদের হাতে বর্শা আর তীর ধনুক তুলে দিয়ে আমরা জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ি। যুদ্ধে যদি পরাজিত হই সকলে এক-সঙ্গে মরব। মরার আগে অগ্নিগোলার মত ফেটে পড়ে রাজশক্তিকে জালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

আব্বাসউদ্দিন। শুধু রাজশক্তিকেই জালিয়ে দিয়ে যাব না বাপজান, সেইসঙ্গে জালিয়ে দিয়ে যাব সারা দুনিয়ার অত্যাচারী মানুষগুলোকে। দুঃখীর ইমানে লাথি মেরে যারা খোদার দুনিয়ার অপরাধ করেছে, তাদের শয়তানীর শেষ করে দেব।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য।

মাণিক পোদ্দারের বাড়ী।

ভবানী ও মধুসূদনের প্রবেশ।

ভবানী। লক্ষ্মী, সোনা, যাদু, মাণিক আমার, রাগ করিস নি। কাল তোকে একটাকাই দেব।

মধুসূদন। একটাকা! তোমার আক্কেলটা কি মা? একটাকায় কি হবে? গোলাপী আতর কেনা হবে? না নাচঘরে গিয়ে নাটক দেখা হবে?

ভবানী। জানি না বাবা, তোর আবার কি বাই! একটাকা দিচ্ছি, আট আনায় আতর কিনবি, আর আট আনায় ভাল-মন্দ খাবি।

মধুসূদন। ভাল-মন্দ খাব! বলি, আট আনায় কি ভাল-মন্দ খাব মা? আর একলা কি খাওয়া যায়?

ভবানী। একলা নয় ত দোকলা কোথায় পাবি? তোর কি আর ভাই-বোন আছে?

মধুসূদন। রক্ষে কর মা! আমার হাতখরচা জোগাতেই তোমরা হাঁপিয়ে পড়ছ, এর ওপর ভাইবোন হলে ত দম আটকে মরে যাবে।

ভবানী। তোর হাতখরচা জোগাতে আমার দম আটকাবে না।

মধু? বলি, মিন্সে কি আমায় একটা পয়সা দেয়? চুরি চামারি করে তেঁতুলের হাঁড়ি আর হলুদের ভাঁড়ে যা লুকিয়ে রাখি তাই ত তোকে দিই বাবা।

মধুসূদন। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, তোমার তেঁতুলের হাঁড়ি আর হলুদের ভাঁড়ে লুকিয়ে রাখা পয়সায় কি আমার হাতখরচ কুলোয় মা?

ভবানী। কেন বাবা? এই ত পঞ্চার মার মুখে শুনি—

মধুসূদন। পঞ্চা? আরে রাম কহো? ও ত এ যুগের ছেলেই নয়। না খায় বিড়ি সিগ্রেট, না খায় মদ ভাং।

ভবানী। কেন বাবা? ও ত লেখাপড়ায় খুব ভাল।

মধুসূদন। ছাই। শুধু কি পড়া মুখস্থ করলেই ভাল ছেলে হয় মা? এ যুগের ভাল ছেলেরা উপন্যাস পড়বে, কথায় কথায় কবিতা বলবে। সিনেমার অভিনেত্রীদের ছবি বুকে নিয়ে ভালবাসার গান গাইবে। মা-বাপের প্যাটরা ভেঙ্গে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা নিয়ে গিয়ে বান্ধবীদের খাওয়াবে। ভাল ভাল জিনিষ উপহার দেবে, আর সোমরস পান করবে।

ভবানী। সোমরস কি রে মধু?

মাণিকের প্রবেশ।

মাণিক। তাও জান না গিন্নি। মদ—মদ। তোমার সোহাগের ব্যাটা এবার মদ খাবে গিন্নি—মদ খাবে!

ভবানী। ওমা! কি ঘেন্নার কথা গো। এ বয়সে তুই মদ খাবি মধু?

মাণিক। শুধু কি মদ? এইবার তোমার সোনার বাছা গাঁজা, গুলি, চণ্ডু, চরস, এমন কি পক্ষরংও সেবন করবে গিন্নি।

মধুসূদন। আমি তোমার মত ছোটলোক নই বাবা, যে ওই সব ছোট ছোট নেশা করব? তবে সোমরস—

মাণিক। আ-হা-হা-হা, বেঁচে থাক যাদু। 'অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে, মায়ের কোল জোড়া করে বেঁচে থাক। এমন না হলে ছেলে। মা-বাপের সামনে ব'ল্ল কিনা সোমরস পান করব।

মধুসূদন। কেন বাবা? সোমরস কি খারাপ জিনিষ? ও ত ঠাকুর পুজোতেও লাগে। আধুনিক সমাজে চলতে গেলে ওসব খেতে হয়। ভাল ভাল লোকের সঙ্গে মিশতে হলে ওসব দিতে হয়।

মাণিক। তা বৈকি—তা বৈকি। ভাল ভাল লোক ত তোরই মত অকালকুষ্মাণ্ড রে হতভাগা!

মধুসূদন। খবরদার বাবা! মুখ সামলে কথা বল। আমি অকালকুষ্মাণ্ড? আমি হতভাগা?

ভবানী। ভীমরতি ধরেছে মধু, বুড়ো হয়ে ওর ভীমরতি ধরেছে। সাতটা-দশটা নয়, একমাত্র ছেলে—

মাণিক। তার মদ গাঁজার টাকা জোগাতে হবে।

মধুসূদন। আর রাগ সামলাতে পাচ্ছি না মা! এখনো বাবা বলে মান রাখছি, এর পর তাও রাখব না।

মাণিক। কি করবি রে হতভাগা? মারবি নাকি?

মধুসূদন। উহুঁ। মার-ধোর হাঙ্গামা করলে নিজেই বিপদে পড়ে যাব। যদি খানে-অখানে লেগে যায়, তাহলে তুমি পিটে ফুঁকবে, আর আমার কাছা গলায় দিয়ে তিরিশ দিন হবিষ্যি করতে হবে। খালি গা, খালি পায়ে বেড়াতে হবে। টেরীওয়ালা চুলটা কামিয়ে তোমার শ্রাদ্ধ করতে হবে বাবা।

মাণিক। কিচ্ছু করতে হবে না যাদুধন, কিচ্ছু করতে হবে

না। আমরা ম'লে শ্মশানঘাটে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দিও। তারপর বাড়ী গিয়ে মাংস পোলাও আর সোমরসের বোতল খুলে বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে হুল্লোড় করো বাবা, তাহলেই তোমার মরা বাপ-মা ড্যাং-ডেঙিয়ে সগ্‌গে চলে যাবে।

ভবানী। মুখে আগুন, মিন্সের কথার ছিরি দেখ! আমার মধুসূদন কি তেমনি ছেলে?

মাণিক। না—না, তোমার মধুসূদন খুব ভাল ছেলে গিন্নি। শুঁড়ির দোকানের সামনে গেলেই বাছার নোলায় জল আসে, আর পথের ধারে ভদ্দরলোকের বাড়ীর জানলায় চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ শুনে আকুলনয়নে চেয়ে থাকে।

মধুসূদন। বাপকা ব্যাটা—সিপাইকা ঘোড়া—কুছ নেহি ত থোড়া থোড়া। বুড়ো হয়ে সাধু সাজছ বাবা! চাঁপা বাগদীর বোনের মুখে শুনেছি, তুমিও ত উঠতি বয়সে ওদের পাড়ায় রাত-দুপুরে বেড়াতে যেতে।

ভবানী। মুখে আগুন মুখপোড়া মিন্সের! ওই চ্যাঁপাই ত ওর ছুঁড়ীদায় ছিল; একদিন ধরা পড়ে গিয়ে দুজনে কি মারটাই না খেলে, একমাস আমায় তেল মালিশ করতে হয়েছিল।

মধুসূদন। ও সব কথা ছেড়ে দাও মা—ছেড়ে দাও! উঠ্‌তি বয়েসে অমন অনেকেই পা হড়্‌কায়। যাক্ বাবা, বগড়াঝাটিতে কাজ নেই। আমায় শতখানেক টাকা মাসোহারায় ব্যবস্থা করে দাও—আমি তোমায় ভাল ছেলে হয়ে থাকব বাবা।

মাণিক। এ্যাঁ! একশো টাকা? ওরে বাবা, এ ব্যাটা আমায় দেউলে করবে।

ভবানী। সিরাজতিরের সলতে ছেলে, ওকে একশো টাকা

মাসোহারা দিলে তুমি দেউলে হয়ে যাবে? বলি, সিন্দুক ভর্ত্তি এত যে টাকা-কড়ি, সোনা-দানা এ সব ভোগ করবে কে?

আব্বাসউদ্দিনের প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। দীন দুঃখী গরীব ভাই-বোনেরা।

সকলে। এঁ্যা! কে তুমি?

আব্বাসউদ্দিন। আমি ডাকাত।

মাণিক। এঁ্যা—ডা-ডা-ডা-কা-ত! [কম্পন]

মধুসূদন। ভয় পেয়ো না বাবা, ভয় পেয়ো না। আমি এই ডাকাতের সঙ্গে বোঝা-পড়া করছি।

আব্বাসউদ্দিন। বোঝা-পড়া কি করবে ছোকরা? সিন্দুকের টাকা-কড়ি, সোনা-দানা এই মুহূর্ত্তে আমার হাতে তুলে দাও!

মধুসূদন। বাঃ! ভারী আব্দারে কথা বল্লে ত! আমাদের সোনা-দানা, টাকা-কড়ি—

আব্বাসউদ্দিন। গরীব ভাই-বোনদের জন্তে খরচ করতে হবে।

ভবানী। এ অন্যায় দাবী বাছা!

আব্বাসউদ্দিন। কিসের অন্যায়? সোনায় খাদ মিশিয়ে যারা হাজার হাজার টাকা সিন্দুকে ভরে, তাদের পাপের কড়ি দীন দুঃখীরাই পাবে। সময় বড় কম—ভাল মুখে সিন্দুকের চাবি দেবে? না মারধোর করতে হবে?

মধুসূদন। উঃ! মারধোর করলেই হল। আমি কি মরদকা বাচ্চা নই? এই এক ঘুসিতে—[ঘুসি বাগাইয়া আব্বাসকে মারিতে গেল, আব্বাস তাহার ডানহাত পাকাইয়া ধরিল] উ-হু-হু, গেছিরে বাবা, গেছি—গেছি। ও বাবা সিন্দুকের চাবিটা দিয়ে দাও!

ভবানী। ও ডাকাত বাবা, তোমার পায়ে পড়ি আমার বাছাকে ছেড়ে দাও। সিন্দুকের চাবি দিয়ে দিচ্ছি।

আব্বাসউদ্দিন। আগে দাও—তারপর ছাড়বো।

ভবানী। বলি ও অলপ্পেয়ে মিন্সে, দিয়ে দাও না।

মাণিক। এই নাও বাবা! সব নিয়ে যাও, কিন্তু দোহাই বাবা, হীরে বসানো কবচটা নিয়ে যেও না।

আব্বাসউদ্দিন। কেন রে ব্যাটা?

মাণিক। ওটা আমার ওচোর স্মৃতি। তোমার পায়ে পড়ি ডাকাত বাবা, হীরে বসানো কবচটা নিও না।

আব্বাসউদ্দিন। তা হবে না। হীরে বসানো কবচ আমি রেখে যাব না। [প্রস্থান।

মাণিক। ওঃ! শুনলে না, ডাকাতটা আমার কোন কথাই শুনলে না। আমার ওচোর স্মৃতি—

ভবানী। হায়-হায়-হায়, কি সর্ব্বনাশ হলো গো—

মধুসূদন। চুপ কর মা—চুপ কর! ডাকাতরা পালালে মাথা চাপড়ে কেঁদো!

ভবানী। ওরে মধুরে, আজ আমরা পথের ভিখিরী হলুম রে!

[মধুসূদনের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

মাণিক। সব নিয়ে গেলেও তত দুঃখ পেতুম না, যত দুঃখ পেয়েছি ওচোর স্মৃতি ওই হীরের কবচটা নিয়ে গেল বলে। ওচো—ওচো! কোথা তুই? দেখে যা, তোর বাপ আজ পথের ভিখিরী হলো, পথের ভিখিরী হলো।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পদ্মনগর রাজপ্রাসাদ।

সৌদামিনী ও সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সৌদামিনী। পরাজয় হ'লো? ডাকাতদলের সঙ্গে যুদ্ধে রাজ-শক্তির পরাজয় হ'লো?

সিদ্ধেশ্বর। হ্যাঁ রাণীমা। এইমাত্র সংবাদ পেলুম, ডাকাত ফৈজুদ্দিনের সন্ধান পেয়ে মহারাজ জঙ্গল ঘেরাও করেছিলেন, কিন্তু ডাকাত ধরা দূরে থাক, নিজেরাই পরাজিত হয়েছেন।

সৌদামিনী। অসম্ভব! ভুল সংবাদ এনেছ সিদ্ধেশ্বর! বিশাল বাহিনী নিয়ে মহারাজ ডাকাত ধরতে গেছেন, এভাবে পরাজিত হওয়া স্বপ্নেরও অগোচর। তুমি এখুনি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী পাঠিয়ে সংবাদ নাও—

ভানুসিংহের প্রবেশ।

ভানুসিংহ। আর কি সংবাদ নেবেন? অতর্কিত আক্রমণে আমাদের শত শত সৈন্য মৃত্যুশয্যায় শায়িত। গোলন্দাজ সৈন্যরা কামান ছেড়ে পালিয়েছে—দাদা বন্দী।

সিদ্ধেশ্বর।
সৌদামিনী। } বন্দী!

ভানুসিংহ। হ্যাঁ! তারই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাকে ডাকাতদের হাতে বন্দী হতে হয়েছে।

সৌদামিনী। ভানুসিংহ!

ভানুসিংহ। গুপ্তচরের মুখে খবর পেয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গিয়ে দেখি গভীর জঙ্গলের মধ্যে ওদের আশ্রয়। প্রথমে আমরা জঙ্গলের বাইরে থেকে কামান দাগলুম, কিন্তু ওদের সাড়াশব্দ না পেয়ে দাদা মাত্র কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন ডাকাতদের খোঁজে।

সৌদামিনী। তারপর—তারপর?

ভানুসিংহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, কারও সাড়া শব্দ নেই। তাই ভয়ে ভয়ে বেশী সৈন্য নিয়ে জঙ্গলে ঢুকলুম। দেখলুম, দাদার দেহরক্ষীরা তীর বিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে, আর দাদা—

সৌদামিনী। থেমো না—থেমো না ভানুসিংহ! বল, সত্যিই কি তিনি বন্দী? না আমার সিঁথির সিঁদুর—

ভানুসিংহ। অক্ষয় হ'য়ে আছে বৌদি! দাদাকে ওরা দেহ-রক্ষীদের সঙ্গী করলে নিশ্চয়ই তার মৃতদেহটা পেতুম। কিন্তু তা যখন পাইনি, তখন নিশ্চয় বন্দী করে নিয়ে গেছে।

সৌদামিনী। দাদাকে বন্দী করে নিয়ে গেল আর সুবোধ ভাই তুমি প্রাণভয়ে শৃগালের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে চলে এলে।

ভানুসিংহ। না বৌদি। এত কাপুরুষ আমি নই। গভীর জঙ্গলে কামান ঠেলে নিয়ে যেতে পারি নি, কিন্তু বন্দুকধারী সৈন্যেরা সঙ্গেই ছিল। অতগুলো মৃতদেহ দেখে খুনের নেশা জেগে উঠল, তখুনি সৈন্যদের বন্দুক চালাতে হুকুম দিলুম।

সিদ্ধেশ্বর। তারপর—তারপর ছোটরাজা। একসঙ্গে অতগুলো সৈন্যের গুলিবৃষ্টিতে নিশ্চয়ই দুদশটা ডাকাত মরেছে?

ভানুসিংহ। একটাও নয়, বরং মরেছে আমারই শত শত সৈন্য।

সৌদামিনী। [অস্ফুটস্বরে] ভানুসিংহ!

ভানুসিংহ। আমরা বন্দুক চালাবার সঙ্গে সঙ্গেই হাজার হাজার তীর আর বর্শার ফলা পড়তে লাগলো। শত শত সৈন্য মৃত্যুশয্যায় ঢলে পড়লো। কোন রকমে জঙ্গলের বাইরে এসে দেখি গোলন্দাজ সৈন্যরা কামান নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

সৌদামিনী। পালিয়ে যাচ্ছে? শত শত সৈন্য মরণ-সমুদ্রে সাঁতার দিলে, মহারাজ নিখোঁজ, তুমি জঙ্গলের মধ্যে বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে, এ দেখেও কাপুরুষ গোলন্দাজ সৈন্যরা কামান নিয়ে পলিয়ে এলো?

ভানুসিংহ। এ ছাড়া উপায় ছিল না বৌদি। একই সঙ্গে অবিশ্রান্ত তীর আর বর্শার ফলা পড়তে লাগল।

সৌদামিনী। তীর আর বর্শার ফলা কি কামানের গোলার চেয়েও ভীষণ? কামান দেগে ডাকাতদের আশ্রয়স্থল সেই জঙ্গলটা উড়িয়ে দিতে পারলে না?

সিদ্ধেশ্বর। তাহলে ছোটরাজাও যে কামানের গোলায় উড়ে যেত মা।

সৌদামিনী। তবু তারা অপরাধী। রাজা আর রাজভ্রাতাকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে প্রাণ বাঁচিয়েছে কাপুরুষের দল, আমি তাদের কঠোর শাস্তি দেব।

ভানুসিংহ। এ সময় উত্তেজিত হলে মহারাজ রাজকুমারী আর রাজপুত্রের উদ্ধার যে অসম্ভব হবে মহারাণি। ডাকাত দমন করতে হলে গোলন্দাজ সৈন্যদেরই প্রয়োজন।

সিদ্ধেশ্বর। সত্য। কিন্তু গোলন্দাজ সৈন্যদের এ স্বেচ্ছাচারিতার

প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ হবে না ছোটরাজা! উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। অপরাধ যখন করেছে—

ভানুসিংহ। তখন দণ্ড দিতেই হবে। কিন্তু আগে রাজকন্যা, রাজপুত্র, আর মহারাজের উদ্ধার? না রাণীত্বের গর্ব্বে অপরাধীর বিচার? কোনটার গুরুত্ব বেশী বুদ্ধিমান?

সিদ্ধেশ্বর। মহারাজ, রাজপুত্র আর রাজকন্যার উদ্ধার আগে প্রয়োজন। কিন্তু আমি ভাবছিলুম, শত শত সৈন্য নিহত হলো, মহারাজকে ডাকাতরা যুদ্ধে হারিয়ে দিলে, গোলন্দাজ সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে গেল, এ অবস্থায় ওদের উদ্ধার করা কি সম্ভব হবে?

ভানুসিংহ। কেন হবে না দেওয়ান? এ রাজ্যে ত সৈন্য বা অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব নেই।

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু—

ভানুসিংহ। কোন কিন্তু নয় দেওয়ান! দাদার ভুলে যে ক্ষতি হয়েছে, তার সংশোধনে এবার আমি অসংখ্য সৈন্য নিয়ে ডাকাতদের আশ্রয়স্থল ঘেরাও করে অবিরত কামান দাগবো। আর কামানের অগ্নি গোলায়—

সিদ্ধেশ্বর। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জঙ্গলসহ ডাকাতরা উড়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে মাংসপিণ্ডের মত উড়ে যাবে পুত্র কন্যা নিয়ে মহারাজ মুকুটসিংহ।

ভানুসিংহ।
সৌদামিনী। } [উভয়ে শিহরিয়া উঠিল] সিদ্ধেশ্বর!

সিদ্ধেশ্বর। ওটা নেহাৎ ছেলেমানুষী। যে অবস্থায় ডাকাতরা আপনাদের কাবু করিয়েছে, তাতে আপোষ মীমাংসা করে ফেলাই ভাল।

সৌদামিনী। সিদ্ধেশ্বর!

সিদ্ধেশ্বর। তাতে ফল ভাল হবে মা। অনর্থক সৈন্যক্ষয়ও হবে না, আর পুত্রকন্যা নিয়ে মহারাজ সসম্মানে রাজধানীতে ফিরে আসবেন।

সৌদামিনী। সসম্মানে নয়, ফিরে আসবেন মাথা নীচু করে রাজআভিজাত্য ডাকাতের পায়ে উপঢৌকন দিয়ে।

ভানুসিংহ। না—না, তা কখনও হবে না। যে আগুন একবার জ্বলেছে, এত সহজে তা নিভবে না। রাজবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় সন্তান আমি, তুচ্ছ ডাকাতের চোখরাঙানীতে আভিজাত্যের মাথায় পদাঘাত করবো না।

[নেপথ্যে পিস্তলের শব্দ ও বহুকণ্ঠে কোলাহল।]

সকলে। ওকি!

সিদ্ধেশ্বর। বাঘের পোষাক পরে কে প্রাসাদে ঢুকেছিল? ওই পালাচ্ছে—ওই পালাচ্ছে!

রক্ষীগণ। [নেপথ্যে] পালালে—পালালো, ধর—ধর।

সিদ্ধেশ্বর। ব্যাপারটা দেখে আসছি।

[প্রস্থান।

ভানুসিংহ। তাই ত! বাঘের পোষাক পরে কে প্রাসাদে ঢুকেছিল? তবে কি শত্রুর কোন গুপ্তচর আমাদের দুর্বলতার সন্ধান নিতে এসেছিল?

সৌদামিনী। পদ্মনগরের শাসনযন্ত্র এত দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই প্রজাবিদ্রোহ—ডাকাতের অত্যাচার—শত্রুর গুপ্তচরের প্রাসাদে অবাধ গতিবিধি।

পত্র হস্তে সিদ্ধেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। গুপ্তচর নয় মা—গুপ্তচর নয়। ডাকাতরা বাঘের পোষাক পরে এসে চিঠিটা লটকে দিয়ে গেছে।

সৌদামিনী। ডাকাতরা প্রাসাদে এসে চিঠিখানা লটকে দিয়ে গেল, আর প্রাসাদের রক্ষীরা কি সব ঘুমিয়ে ছিল সিদ্ধেশ্বর?

সিদ্ধেশ্বর। না মহারাণি। তারা সবাই পাহারা দিচ্ছিল।

সৌদামিনী। সবাই পাহারা দিচ্ছিল, অথচ কেউ তাকে আহত করতে পারলে না?

সিদ্ধেশ্বর। না মহারাণি।

সৌদামিনী। শয়তান—শয়তান! প্রাসাদরক্ষীরা সবাই শয়তান! ডাকাতদের কাছ থেকে প্রচুর উৎকোচ নিয়ে ওদের সাহায্য করছে। ওদের সবাইকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে গুলি কর ভানু!

ভানুসিংহ। চিঠিখানা পড় ত দেওয়ান।

সিদ্ধেশ্বর। পড়েছি।

ভানুসিংহ। কি লিখেছে?

সিদ্ধেশ্বর। সেই একই কথা, হরিপুরের দাবী মেটাও—নইলে কারো নিস্তার নেই।

ভানুসিংহ। দাদার কথা কিছু লিখেছে?

সিদ্ধেশ্বর। লিখেছে। মহারাণীকেও শাসিয়েছে, যদি জেদ না ভাঙে, তাহলে মহারাজের মৃতদেহ উপহার নিতে হবে।

সৌদামিনী। এঁ্যা! [পড়িয়া যাইতেছিল]

ভানুসিংহ। বৌদি—বৌদি!

সিদ্ধেশ্বর। মা! মা!

সৌদামিনী। না—না, সামলে নিয়েছি। মহারাজের মৃতদেহের উপহার—[সহসা সিঁথিতে চাপ দিয়া] এই লাল টকটকে সিঁদুর, যা সিঁথি ভরে পরে এসেছি অন্নপূর্ণা মায়ের মন্দিরে, সেই সিঁদুর কি চিরদিনের মত—না—না, এ কি ভাবছি? এত শীঘ্র আমায় বৈধব্য নিতে হবে? না—না, পিতা যে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন পাকা চুলে সিঁদুর পরে স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরব, সে আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হবে না। ভানুসিংহ, বাহিনী সাজাও—আমি নিজে যাব ডাকাত দমনে।

মাণিকের প্রবেশ।

মাণিক। তাই যান মহারাণী। ডাকাতের অত্যাচার বন্ধ না হলে রাজ্যটাই যে শ্মশান হয়ে যাবে।

সিদ্ধেশ্বর। কে তুমি? সংবাদ না দিয়ে প্রাসাদে ঢুকেছ?

মাণিক। সংবাদ দেবার ধৈর্য্য নেই দেওয়ান। রাত্রে ডাকাতরা আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে। ছিলুম রাজধানীর জাঁদরেল পোদ্দার, আজ হয়েছি পথের ভিখিরী।

সৌদামিনী। শুনছো—শুনছো ভানু? শুনছো সিদ্ধেশ্বর? আজ ডাকাতদের অত্যাচারে পদ্মনগর শ্মশান হতে বসেছে।

মাণিক। রাজশক্তি যদি এর প্রতিকার না করে, তাহলে শুধু আমি নই, রাজধানীর বড় বড় ব্যবসাদার আর মহাজনেরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে। এই কথাটাই জানিয়ে দিয়ে গেলুম রাণীমা!

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। ওঃ! ব্যাটা চোখ রাঙাতে এসেছে। ওর মত একটা পুঁচকে পোদ্দার—

সৌদামিনী। তবু পদ্মনগরের প্রজা, আমার সন্তান। আমার শত শত প্রজা আজ ডাকাতের অত্যাচারে নিঃস্ব হয়ে পথে দাঁড়িয়েছে, তাই প্রাণের দায়ে দেশত্যাগ করবার আগে একবার জানিয়ে দিতে এসেছে। এ যে রাজশক্তির কতবড় অক্ষমতা তা কি একবার ভেবে দেখেছ সিদ্ধেশ্বর!

সিদ্ধেশ্বর। দেখেছি মা। রাজশক্তির চেষ্টার কোন ত্রুটী নেই। ডাকাত ধরতে গিয়ে মহারাজ নিজেই ডাকাতদের ফাঁদে ধরা প'ড়েছেন।

সৌদামিনী। সে ফাঁদ ছিঁড়ে আমিই মহারাজকে উদ্ধার করব।

ভানুসিংহ। বৌদি! বৌদি!

সিদ্ধেশ্বর। মা! মা!

সৌদামিনী। আমার শিশুসন্তান, কুমারী মেয়ে আর স্বামী বন্দী এ সময়ে আমি কি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারি? দশ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে চল ভানুসিংহ! আজ পদ্মনগরের রাণী বীরাঙ্গনার সাজে ক্ষুধিতা সিংহিনীর মত সকলের আগে ছুটে যাবে, সন্তানতুল্য প্রজাদের ধন-প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে। যদি, স্বামী, পুত্র আর কন্যাকে উদ্ধার করে অত্যাচারী ডাকাতদের বন্দী করতে পারি, তাহলেই ফিরে আসবো, নইলে এই আমার অগস্ত্য যাত্রা।

[ভানুসিংহ সহ প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই তোমাদের অগস্ত্য যাত্রা দাম্ভিকা নারি! আমার প্রভুকে নিঃস্ব পথের ভিখারী করে পত্নীপুত্রের সঙ্গে তোমার স্বামী দেশছাড়া করেছিল, তার প্রতিশোধে এই উনিশ বছর পরে আমিও তোমাদের সগোষ্ঠী অগস্ত্য যাত্রা করিয়ে পদ্মনগর রাজ্যটা প্রজাদের হাতে তুলে দেবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

তৃতীয় দৃশ্য।

কৈজুদ্দিনের কুঁড়েঘর।

অচিন্ত্য ও সাধনার প্রবেশ।

সাধনা। না—না, আজ তোমাকে যেতে দেব না।

অচিন্ত্য। এ তোমার ভারী অন্যায় সাধনা! দিনরাত তোমার সঙ্গে থেকে নিজের ওপর নিজেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য জঙ্গলে পাখী শিকার করতে যেতে দাও!

সাধনা। আর আমি তোমাকে ব্যাধের কাজ করতে দেব না।

অচিন্ত্য। সে কি! তীর ধনুকের মধ্যেই যে অচিন্ত্য একদিন নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল—

সাধনা। আজ সে নীতি বদলে বিলিয়ে দিতে হবে নিজেকে রঙিন দুনিয়ার মাঝে।

অচিন্ত্য। সাধনা!

সাধনা। জীবহত্যা তোমার সাজে না বন্ধু, তুমি যে প্রেম রাজ্যের রূপকুমার।

অচিন্ত্য। প্রেমরাজ্যে কি শুধু কাপুরুষরাই থাকে?

সাধনা। কাপুরুষের স্থান প্রেমরাজ্যে নেই বন্ধু!

অচিন্ত্য। তাহলে কেন আমাকে পাখী শিকারে যেতে দিচ্ছ না?

সাধনা। পাখীরা ত তোমার কোন অনিষ্ট করেনি, কেন তাদের হত্যা করে ভগবানের অভিশাপ কুড়িয়ে নেবে?

৮

অচিন্ত্য। সাধনা !

সাধনা। মুক্ত পাখীরা জোড় বেঁধে গাছের ডালে বসে কত স্বপ্নের জাল বোনে, তাদের মেরে ফেললে ভগবান কি রুষ্ট হবে না ?

অচিন্ত্য। সূক্ষ্ম বিচার বোধ নিয়ে এ দুনিয়ায় বাস করা চলে না সাধনা। পাখী শিকারে আনন্দ আছে, তীর ধনুকের লক্ষ্য ঠিক হয়। তাই শিকারী যায় শিকারের নেশায় মত্ত হয়ে।

সাধনা। [আপন মনে বলিতেছিল] পাখী শিকারে যাদের আনন্দ হয়, তারা কি হাতের কাছে ধরা দেওয়া পাখীর কদর বোঝে না ?

অচিন্ত্য। এ সব কি বলছো ? পাখীরা স্বেচ্ছায় এসে ধরা দেয় না।

সাধনা। দেয়—দেয়। কিন্তু শিকারী সেটা গ্রাহ্য করে না পাখীর সাধ শিকারীর হাতে ধরা দিয়ে—না না, এ আমি কি বলছি ? হাঃ-হাঃ-হাঃ, এ যে রূপকথার গল্প।

অচিন্ত্য। গল্প ?

সাধনা। হ্যাঁ ! রূপকথার গল্প। একটা শুকপাখী ধরা দিয়েছিল—

অচিন্ত্য। ব্যাধের হাতে। ব্যাধ তাকে বেচে ফেলেনি। সোনার খাঁচায় পুরে ছাতু ছোলা খাওয়াত আর নতুন বুলি শেখাতো।

সাধনা। হ্যাঁ ! যারা দুনিয়াকে রঙিন দেখে, তারাও নিজের সত্বা ভুলে গিয়ে ব্যাধের সোনার খাঁচায় থাকতে চায়।

অচিন্ত্য। [সবিস্ময়ে] তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কারা দুনিয়াটাকে রঙিন দেখে ?

সাধনা। যারা বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ভুলে অনাত্মীয়কে আপন করে নেয়।

অচিন্ত্য। এমন মানুষ—

সাধনা। আছে কিনা বুঝতে পারো না বন্ধু? এই যে আমি ডাকাতের বন্দিনী হয়ে থেকেও আত্মীয়-স্বজন ভুলে নিজেকে সুখী মনে করছি—শুধু তোমার সঙ্গ পেয়ে। তুমি যে তাকে স্বপ্নের রাজ্যে টেনে নিয়ে গেছ প্রিয়তম! তার মনের ঘুমন্ত প্রেম-কলি জেগে উঠেছে তোমার পরশে। তার রঙিন দুনিয়ায় শুধু একটি মানুষের মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে। সে তুমি—তুমি—তুমি!

[চোখ বাঁধা মুকুটসিংহকে লইয়া ফৈজুদ্দিন দূরে আসিয়া দাঁড়াইল, অচিন্ত্য ও সাধনা বুঝিতে পারিল না।]

অচিন্ত্য। এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে? আজীবন অবজ্ঞার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে পরের ঘরে মানুষ হয়েছি। মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে কিনা জানি না। শুধু একটানা চলেছি তীর-ধনুকের সাধনায়। পথে বেরিয়ে ডাকাতের কথায় নির্ভর করে এসেছিলুম জনসেবার ব্রত গ্রহণ করতে। কিন্তু একি পরিবর্ত্তন? না—না, এ হতে পারে না। আমি যে পরিচয়হীন পথের ছেলে, আমাকে তোমার প্রেম-রাজ্যে অধিবাসী করতে চেয়ো না।

সাধনা। আর আমার কিছু নেই প্রিয়! হও তুমি পরিচয়হীন পথের ছেলে, তবু তোমাকেই সহকার করে জড়িয়ে দিলুম আমার জীবনলতা। [অচিন্ত্যর বক্ষে মুখ রাখিল]

অচিন্ত্য। [বক্ষে মুখ চাপিয়া] সাধনা—সাধনা!

[ফৈজুদ্দিন মুকুটসিংহের চোখ খুলিয়া দিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল।]

মুকুটসিংহ। এ কি! সাধনা! কালামুখী!

ফৈজুদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই তোমাদের আভিজাত্য রাজা!

সাধনা। [মাথা নত করিয়া] বাবা! বাবা!

মুকুটসিংহ। চুপ কর কলঙ্কিনী!

সাধনা। এখানে—তোমাকে—

ফৈজুদ্দিন। ধরে এনেছি, হাতে হাতে প্রমাণ করতে—রাজ আভিজাত্যের দাম কানা কড়িও নয়।

অচিন্ত্য। রাজ-আভিজাত্য! তাহলে এই কুমারী--

ফৈজুদ্দিন। রাজার মেয়ে; পদ্মনগরের রাজা মুকুটসিংহ ওর বাবা।

অচিন্ত্য। এই পদ্মনগরের রাজা? প্রণাম নিন মহারাজ—

ফৈজুদ্দিন। না! এখানে কেউ কারো পায়ে মাথা নোয়াতে পারে না।

অচিন্ত্য। উনি যে আমাদের রাজা!

ফৈজুদ্দিন। হলেও ওকে প্রণাম করতে পারবে না জোয়ান! ডাকাত ফৈজুদ্দিনের এলাকায় ছোট বড় বিচার নেই, রাজা প্রজায় ব্যবধান নেই, জাত অজাতের বিচার নেই, এখানে সবাই সমান। সবাই মাথা নোয়াবে সেই এক খোদার উদ্দেশ্যে।

মুকুটসিংহ। সবাই সমান বলেই বুঝি আমার মেয়ের জীবনে এত বড় কলংক—

ফৈজুদ্দিন। কলংক? হাঃ-হাঃ-হাঃ! মানুষ মানুষকে ভালবাসবে তাতেও কলংক? প্রেমের দুনিয়ায় আভিজাত্যের ঠাঁই হবে না রাজা, শরতের মেঘের মতই উড়ে যাবে।

সাধনা। আভিজাত্যের বিষবাষ্পে সাম্যের পথ অন্ধকার হয়ে আছে বাবা, পুরাতন নীতি বিসর্জন দিয়ে প্রেমের দুনিয়ায় ভালবাসা দিয়ে সকলকে জয় করুন। শাসনের উদ্ধত কশা ফেলে দিয়ে উদার হাতে

দান করুন আপনার আধিপত্য। সংস্কার ত্যাগ করে আমাকে এই বীর যুবকের হাতে সম্প্রদান করুন বাবা!

মুকুটসিংহ। হ্যাঁ, তোকে চিরদিনের মত তুলে দেবো, তবে এই পরিচয়হীন ভিক্ষুকের হাতে নয়,—যমের হাতে।

[সহসা ফৈজুদ্দিনের কটিদেশ হইতে ছোরা লইয়া সাধনাকে হত্যায় উদ্যত।]

ফৈজুদ্দিন। [হাত ধরিয়া] হুঁসিয়ার রাজা! ডাকাত ফৈজুদ্দিনের এলাকায় নারী হত্যা করলে কঠিন সাজা নিতে হবে।

মুকুটসিংহ। তাই দাও সর্দ্দার, তুমি আমায় কঠিন সাজাই দাও। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু এই কুলটাকে—

সাধনা। সাবধান বাবা, মিথ্যা অপবাদ দিলে—

মুকুটসিংহ। এখনো নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে চাস কলংকিনী? আমি যে নিজের চোখে দেখলুম।

সাধনা। যাকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছি, তার বুকে—

ফৈজুদ্দিন। আর কথা নয়। তোর বাপ স্বীকার না করলেও সারা দুনিয়া মেনে নেবে মা, এই পরিচয়হীন যুবাই তোর স্বামী আর তুই তার বিবাহিতা স্ত্রী।

মুকুটসিংহ। সর্দ্দার!

ফৈজুদ্দিন। চোখ রাঙিয়ে সত্যকে চাপা দিতে পারবে না রাজা! চলো, আবার সেই মাটির নীচে আমাদের কেল্লাঘরে।

সাধনা। না—না, বাবাকে আটকে রেখো না সর্দ্দার! আমি সারাজীবন তোমাদের বন্দিনী হয়ে থাকব, শুধু আমার বাবাকে ছেড়ে দাও।

ফৈজুদ্দিন। তা হয় না রে বেটি, তা হয় না। দেশ আর দশের

দাবী নিয়ে চলেছে যুদ্ধ, এ যুদ্ধের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত রাজাকে বন্দী হয়েই থাকতে হবে।

মুকুটসিংহ। এ যুদ্ধের শেষ হবে না—হতে পারে না। এখনো ভাই ভানুসিংহ জীবিত; যে ভুলে আমি আজ বন্দী হয়েছি, সে ভুলের সংশোধন করতে আবার সে আসবে তোমাদের ডাকাতির চির অবসান করে দিতে।

ফৈজুদ্দিন। আমাদের ডাকাতির অবসান সেইদিনই হবে রাজা, যেদিন পদ্মনগরের প্রজারা হবে স্বাধীন।

[মুকুটসিংহকে লইয়া প্রস্থান।

অচিন্ত্য। পদ্মনগর পরগণার প্রজারা স্বাধীন হলে এরা ডাকাতি ছেড়ে দেবে? এত মহৎ উদ্দেশ্য যাদের, তাদের স্বপক্ষে আমিও যুদ্ধ করবো।

সাধনা। প্রিয়তম!

অচিন্ত্য। ফিরে যাও রাজকন্যা। দেশ ও দশের দাবী নিয়ে যুদ্ধ চলেছে, এ যুদ্ধের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বিবাহ হতে পারে না। রাজশক্তির সঙ্গে অচিরেই আমাদের যুদ্ধ হবে, সেই যুদ্ধে যদি বাঁচি তাহলেই বাঁধবো দুজনে সোনার সংসার। আর যদি মরি—

সাধনা। না—না, ও কথা বলো না! তুমি মৃত্যুঞ্জয়, তোমার মৃত্যু হবে না—হতে পারে না।

অচিন্ত্য। রাজকন্যা!

সাধনা। মরজগতে যদি মিলন না হয়, লোকান্তরে মিলন হবে প্রিয়তম! অস্ত্র হাতে তুমি যাও রণক্ষেত্রে, যদি বিজয়ী হয়ে ফিরে এস—

আব্বাসউদ্দিনের প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। তাহলে ঘটা করে তোদের সাদী দিয়ে আমরা পেট ভরে কালিয়া পোলাও খাবো বহিন্!

সাধনা। আব্বাস-ভাই!

আব্বাসউদ্দিন। সব শুনেছি দিদি! লজ্জা কি? ওরে, তোর বুকে যে মানুষের দরদ আছে, আমি তোকে ধরে আনবার দিনই তা বুঝেছিলুম। তাই এই খাঁটি হীরের টুকরোটাকে তোর খবরদারী করতে রেখে ছিলুম বহিন্। উদ্দেশ্য আমার সফল হয়েছে। চল জোয়ান, দেশের কাজে এগিয়ে চল! খোদার মেহেরবানীতে আমরা সব যুদ্ধেই জিতেছি, এবার যদি যুদ্ধ হয়—

অচিন্ত্য। পরাজয়ের চিন্তা নিয়ে কেউ যুদ্ধ করে না ভাইজান! মহাভারতেই আছে কুরুক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশ করে দুর্য্যোধন ভীষ্মদেবকে বলেছিলেন,—পিতামহ! শ্রীকৃষ্ণদত্ত নারায়ণী সেনা আর অসংখ্য বীর আমার সহায়, মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে পাণ্ডবেরা কোন সাহসে রণাঙ্গণে এসেছে? তখন ভীষ্মদেব হাসিমুখে বললেন, হারজিতের চিন্তা না করে শুধু ভগবান ভরসা করে পাণ্ডবেরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে। ধর্ম্মযুদ্ধে যে পক্ষের জয় হওয়া উচিত, ভগবান সেই পক্ষকেই জয়যুক্ত করবেন।

সাধনা। তাই ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথি হয়ে পাণ্ডবদের বিজয়ী করলেন।

আব্বাসউদ্দিন। তাহলে আমাদেরও জয় হবে বহিন্! শক্তিমান মানুষরা দুর্ব্বল মানুষদের বুকে বাণ হানছে, তাই খোদার টনক নড়ে উঠেছে জোয়ানভাই! চল—চল, এবার তোমাকেও যুদ্ধ করতে হবে। [অচিন্ত্যসহ প্রস্থানোদ্যোগ]

সাধনা। ভাইজান!

আব্বাসউদ্দিন। চিন্তা করিস নি বহিন্। দেশের কাজে যাচ্ছি, কাজ শেষ হলেই নূতন বোনাইয়ের কান ধরে টেনে এনে তোর আঁচলে বেঁধে দেব।

[হাসিতে হাসিতে অচিন্ত্যসহ প্রস্থান।

সাধনা। প্রেমের বন্যায় আভিজাত্যের প্রাসাদ ভেসে গেল। ভ্রাতৃস্নেহের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আজ রাজার দুলালী বাঁধা পড়েছে ডাকাতের ঘরে।

কানাইসিংহ। [নেপথ্যে] গীত।

ঘরের বাঁধন কাটল এবার পর হল রে আপনজন।

সাধনা। এ কি! এ যে পরিচিত কণ্ঠ। তবে কি কানাই—

গীতকণ্ঠে কানাইসিংহের প্রবেশ।

কানাইসিংহ। গীত।

ঘরের বাঁধন কাটল এবার পর হল রে আপনজন!
[ভাই] ছোট বড়র বিচার ভুলে নিলুম তুলে পরম ধন।
হেথা ভালবাসার ঝর্ণা ঝরে,
সবাই বুকে জড়িয়ে ধরে,
সাম্য পূজা ঘরে ঘরে পরে সবাই ঐক্য বাঁধন।

সাধনা। কানাই—কানাই, তুইও এখানে?

কানাইসিংহ। আমি যে তোকে খুঁজে মরছি দিদি! এরা যে আমাকেও ধরে এনেছে।

সাধনা। ধরে এনেছে!

কানাইসিংহ। হ্যাঁ দিদি। এখানে এসে আর একটা নূতন

মা পেয়েছি, কি তার ভালবাসা। বাড়ী ফিরতে মন আর চাইছে না।

সাধনা। কে—কে সেই মা?

কানাইসিংহ। পূর্ব্বগীতাংশ।

পরিচয় তার কি দেব গো দিদি, সে যে মরতের মানবী নয়।
চোখে মুখে তার মমতা মাখানো, রূপেতে অমরা করিছে জয়।
এস এস দিদি সে মায়ের কাছে,
শত স্নেহাশীষ তার বচনে করিছে,
দেখিবে জননী হাসি ভরা মুখে ছেলে মেয়েদের দেয় অভয়।

[গাহিতে গাহিতে সাধনার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

—:•:—

চতুর্থ দৃশ্য।

ফৈজুদ্দিনের কুটীর প্রাঙ্গণ।

ফৈজুদ্দিন ও আব্বাসউদ্দিনের প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। টাকা ফুরিয়ে গেছে বাপজান! তাই শহরে যেতে হবে গহনা বিক্রী করতে।

ফৈজুদ্দিন। শহরে গহনা বিক্রী করতে যাবি? তাইত!

আব্বাসউদ্দিন। কোন চিন্তা নেই বাপজান!

ফৈজুদ্দিন। রাজা মুকুটসিংহের ভাই চারিদিকে গুপ্তচর পাঠিয়েছে। শহরে গহনা বিক্রী করতে গেলে যদি ধরে ফেলে?

আব্বাসউদ্দিন। তোর ব্যাটা আব্বাসকে ধরবার মত চর দুনিয়ায় কেউ নেই বাপজান। চিন্তা করিস নি, আমি গহনা বিক্রী করে খুব শীগ্‌গির ফিরে আসব।

কৈজুদ্দিন। না—না, কাজ নেই বিপদের মাঝে পা পাড়িয়ে। তুই অন্য কাউকে পাঠিয়ে দে আব্বাস।

আব্বাসউদ্দিন। মুকুটসিংহের ভাই যদি গুপ্তচর রেখে থাকে, তাহলে যে গহনা বিক্রী করতে যাবে সেই ত ধরা পড়ে যাবে বাপজান!

কৈজুদ্দিন। কিন্তু একটা উপায় আছে।

আব্বাসউদ্দিন। কি বাপজান?

কৈজুদ্দিন। রাজকুমারীর খবরদারী করতে যাকে রেখেছিলি, তাকেই গহনা বিক্রী করতে পাঠিয়ে দে আব্বাস। ও পদ্মনগরের লোক, ওকে কেউ সন্দেহ করবে না।

আব্বাসউদ্দিন। এ যুক্তি মন্দ নয়। কিন্তু এতবড় দায়িত্ব তার ঘাড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে বাপজান?

কৈজুদ্দিন। ঠিক হবে। রাজকুমারীর সঙ্গে ছেলেটার ভাব হয়েছে, যে কাজে পাঠাবি সে কাজই কত্তে করে আসবে।

আব্বাসউদ্দিন। তবে গহনাগুলো রাখ বাপজান, আমি ওকে ডেকে আনি। [কৈজুদ্দিনের হাতে গহনার থলি দিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

কৈজুদ্দিন। ওখানে কিছু বলিস নি আব্বাস, এখানে ডেকে এনে বলবি।

আব্বাসউদ্দিন। তাই হবে বাপজান! [পুনঃ প্রস্থানোদ্যোগ]

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দাকিনী। কোথায় চলেছ আব্বাস?

আব্বাসউদ্দিন। কাজ আছে বহিন্! এখুনি আসব।

মন্দাকিনী। দরিদ্র ভাণ্ডারের খরচের টাকা—

আব্বাসউদ্দিন। আজই জোগাড় হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

মন্দাকিনী। আব্বাস কোথায় গেল বাপজান?

ফৈজুদ্দিন। গহনা বেচে টাকা জোগাড় করতে হবে, তাই শহরে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করতে গেছে।

মন্দাকিনী। গহনা বেচতে কে যাবে বাবা?

ফৈজুদ্দিন। যাকে রাজকুমারীর কাছে রেখেছিলুম, সেই যাবে মা। [হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ] ওকি! ওকি!

মন্দাকিনী। মনে হয়, কেউ পটকা ছুঁড়ে পরীক্ষা করছে। [পুনরায় শব্দ হইল]

ফৈজুদ্দিন। না, ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না। তুই গহনার থলিটা রাখ মা, আমি একবার দেখে আসি।

[গহনার থলি দিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

মন্দাকিনী। এই গহনার থলি—

ফৈজুদ্দিন। আব্বাস ছেলেটাকে আনলে দিয়ে দিস।

[প্রস্থান।

মন্দাকিনী। এ কি জীবন আমার? ডাকাতের ঘরে ডাকাতি করা গহনা, টাকাকড়ি নাড়াচাড়া করছি, পরকে আপন করে নিশ্চিন্ত আছি। ওঃ ভগবান, স্বামী পুত্র হারিয়ে অভাগিনীর আজও মৃত্যু হল না! জানি না আর কতদিন এ বিরহ কাতর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকব।

অচিন্ত্যর হাত ধরিয়া আব্বাসউদ্দিনের পুনঃ প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। বিপদে পড়ে তোমার স্মরণ নিতে হয়েছে অচিন্ত্যভাই! গহনা বিক্রি করে টাকা না আনলে আজ আর দরিদ্র ভাণ্ডারের খরচ চলবে না। নিরন্ন ভাই বোনেরা হতাশ হয়ে ফিরে যাবে।

অচিন্ত্য। গহনা বিক্রি করতে কোথায় যেতে হবে?

আব্বাসউদ্দিন। শহরে। নিজেই যেতুম, কিন্তু চারিদিকে রাজ-কর্ম্মচারীদের সতর্কদৃষ্টি, শহরে গেলে ধরা পড়ে যাব। তুমি শহরের মানুষ, তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না।

অচিন্ত্য। গহনা বিক্রি করার অভিজ্ঞতা নেই, যদি ঠকে যাই?

আব্বাসউদ্দিন। তাতে মরব না ভাইজান। কেমন, এইবার রাজী ত?

অচিন্ত্য। বেশ, গহনা দাও।

মন্দাকিনী। যেতে দিও না আব্বাস। ওকে যেতে দিও না।

আব্বাসউদ্দিন। কেন বহিন্?

মন্দাকিনী। ওকে দেখে আমার বুকে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ তোলপাড় করে উঠছে, মাতৃস্নেহের বন্যা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে, কর্ম্মনিরত হাত দুটো ওকে বুকের কাছে টেনে নিতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওরে সুন্দর যুবক, তোর পরিচয় দে!

অচিন্ত্য। আমার পরিচয়? না—না, একি, বুকের মধ্যে কেন ঝড় উঠল? তোমাকে যেন আপন বলে মনে হচ্ছে। বল—বল তুমি কি, না—না, একি দুর্ব্বলতা? আমি যে কল্যাণী ব্রতধারী মুক্তিসেনা! আমায় ছুটতে হবে, দুর্গম অরণ্য, গিরিকান্তার অতিক্রম

করতে হবে, জনগণের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। দাও—দাও আব্বাসভাই! গহনাগুলো দাও, আমি এখনি যাব।

মন্দাকিনী। না—না, যাসনি তুই।

আব্বাসউদ্দিন। আজ তোমার কি হল বহিন? কেন ওকে বাধা দিচ্ছ?

মন্দাকিনী। কেন? সে তুমি বুঝবে না আব্বাস।

আব্বাসউদ্দিন। এ দুর্ব্বলতা সাজে না বহিন্! দাও, দিয়ে দাও গহনার থলি। কাজ শেষ করে ফিরে এলে তবে ত গরীব ভাই-বোনদের টাকা দিতে পারব।

মন্দাকিনী। ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ! ভুলে গিয়েছিলুম আব্বাস, এই নাও গহনার থলি। [গহনার থলি আব্বাসকে দিল]

আব্বাসউদ্দিন। এই নাও অচিন্ত্যভাই, খুব সাবধানে নিয়ে যেও। ওই গহনাগুলো ছাড়া আর আমাদের কোন সম্বল নেই। হ্যাঁ, দেখ। একটা হীরের কবচ ওর মধ্যে আছে, সেটা দিয়ে যাও।

অচিন্ত্য। হীরের কবচ?

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ! ওটা বড় দামী, ওর দাম পোদ্দার ব্যাটারা দেবে না। [থলির মধ্য হইতে হীরকখচিত কবচ বাহির করিয়া] এটা রেখে দাও বহিন।

মন্দাকিনী। [কবচটা দেখিতে দেখিতে] আব্বাস—আব্বাস! এ কবচ তুমি কোথায় পেয়েছ?

আব্বাসউদ্দিন। ওই গহনাগুলো যার কাছ থেকে ডাকাতি করে এনেছি। কিন্তু, কেন বহিন, কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ?

মন্দাকিনী। এ কবচ যে বড় পরিচিত। দেখ—দেখ আব্বাস, এই সাতখানা হীরে বসানো কবচ। [কবচ দেখাইল]

অচিন্ত্য। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সাতখানা হীরে বসানো সোনার কবচ, ঠিক এই কবচটাই ত? ভাইজান! ভাইজান! বল, এ কবচ তুমি কোথায় পেয়েছ?

আব্বাসউদ্দিন। কেন—কেন অচিন্ত্য? এ কবচ তুমি চেন?

অচিন্ত্য। চিনবো না? এর সঙ্গে যে আমার জীবনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ভাইজান! ভাইজান! সত্য বল, পদ্মনগর রাজধানীর মাণিক পোদ্দারের ঘরে ডাকাতি করে এই হীরের কবচটা এনেছ?

আব্বাসউদ্দিন। হ্যাঁ—হ্যাঁ অচিন্ত্যভাই, সেখান থেকেই ডাকাতি করে এনেছি। সিন্দুকের চাবী দেবার সময় বড় কাতর স্বরে সেই বুড়ো পোদ্দারটা বলেছিল, তোমরা সব নিয়ে যাও, শুধু হীরে বসানো কবচটা নিও না,—"ওটা আমার ওচোর স্মৃতি।"

অচিন্ত্য। [উচ্চকণ্ঠে] ওচোর স্মৃতি—ওচোর স্মৃতি! কি করেছ সর্দার? আমার পালক পিতার ঘর থেকে আমারই হীরে বসানো কবচ ডাকাতি করে এনেছ?

মন্দাকিনী। এই হীরে বসানো কবচ তোমার? ওরে সুন্দর যুবক, বল্—বল্ কে তুই? কে তোর পিতা?

অচিন্ত্য। জানি না কে আমার পিতা; আমি পদ্মনগরের মাণিক পোদ্দারের ঘরে পালিত হয়েছি, শুনেছিলুম পথ থেকে আমাকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিল।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন ও বহুকণ্ঠে কোলাহল।]

ছুটিয়া কৈজুদ্দিনের প্রবেশ।

কৈজুদ্দিন। জঙ্গল ঘেরাও করেছে আব্বাস! আর ছেলেটাকে শহরে পাঠাবার সময় নেই। চল্—চল্, সকলে দলবদ্ধ হয়ে গাছে উঠে তীর চালিয়ে ওদের ফেরাতে হবে।

অচিন্ত্য। কিন্তু আমার পালক পিতার ঘরে ডাকাতি করে যে গহনা এনেছ—

আব্বাসউদ্দিন। সে বিচার পরে হবে জোয়ানভাই। চল্—চল্, তীরন্দাজদের পুরোভাগে থেকে তুমি রাজসৈন্যদের ওপর তীর ছুড়বে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আর সময় নেই ছুটে চল।

মন্দাকিনী। না—না, ওকে নিয়ে যেও না ভাইজান! ও যে আমারই হারানো রতন।

ফৈজুদ্দিন। আজকের লড়াইয়ে যদি বাঁচি, তাহলে তোর রতন তোকেই ফিরিয়ে দেব বহিন্! নইলে এই শেষ! আয়—আয় জোয়ান, গাছে উঠে লড়াই করবি আয়।

[অচিন্ত্যর হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

মন্দাকিনী। [অচিন্ত্যকে ধরিয়া] না—না, আমার হারিয়ে যাওয়া মাণিককে মৃত্যুমুখে যেতে দেব না।

অচিন্ত্য। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তোমার স্নেহ আকর্ষণে আমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না—হবে না।

[জোর করিয়া ছাড়াইয়া ফৈজুদ্দিন সহ প্রস্থান।

আব্বাসউদ্দিন। হাজার হাজার মানুষের রক্তে মাটি ভিজলে তবেই আসবে স্বাধীনতা। সত্যই যদি অচিন্ত্য তোমার ছেলে হয় বহিন্, তাহলে জনগণের কল্যাণে ওকে উৎসর্গ কর; দেশের হাজার হাজার মানুষ তোমায় পুজো করবে। [প্রস্থান।

মন্দাকিনী। না-না, আমি হাজার হাজার মানুষের পুজো চাই না, চাই ওই একটা ছেলের মা হয়ে যুগ যুগ ধরে বুকে নিয়ে মাতৃস্নেহের অমিয় ধারায় স্নান করতে। ওরে দুরন্ত ছেলে, ফিরে আয়-ফিরে আয় তুই। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ভবানন্দ। [নেপথ্যে] না—না, আর কারও বাধা মানব না। বহুদিন ঘুরে ডাকাত ফৈজুদ্দিনের সন্ধান পেয়েছি।

মন্দাকিনী। [চমকিত হইয়া] কে—কে চীৎকার করছে? ও কার কণ্ঠস্বর?

দ্রুতপদে ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। একমাস অনাহারে আছি, ডাকাতের ঘরে আজ পেট ভরে খাব আর নাক ডাকিয়ে ঘুমব।

মন্দাকিনী। কে তুমি?

ভবানন্দ। [চমকিত হইয়া] তু—তু—তুমি? বল—বল, তুমি কি—তুমি কি—

মন্দাকিনী। এ যে পরিচিত কণ্ঠ। বল—বল উন্মাদ, কে তুমি?

ভবানন্দ। আমি ভিখারী, পথের ভিখারী। কিন্তু তুমি কে? বল-বল নারী, তুমি কি ভবানন্দ পালের পত্নী?

মন্দাকিনী। আমি—আমিই সে অভাগিনী। প্রভু! স্বামী! দেবতা! [পদতলে পড়িল]

ভবানন্দ। না—না, সত্য নয়। স্বপ্ন—স্বপ্ন।

মন্দাকিনী। না—না প্রভু, স্বপ্ন নয়। সত্যই আমি তোমার পদ-সেবিকা হতভাগিনী মন্দাকিনী।

ভবানন্দ। মন্দাকিনী—মন্দাকিনী! তাহলে আমার খোকা আমার বুকের মাণিক?

মন্দাকিনী। উনিশ বছর আগে সেও হারিয়ে গেছে।

ভবানন্দ। হারিয়ে গেছে? খোকা হারিয়ে গেছে?

মন্দাকিনী। হ্যাঁ প্রভু! জঙ্গলের পথ থেকে ডাকাতসর্দারের ছেলে আমায় ধরে এনেছিল—

ভবানন্দ। ধরে এনেছিল। তাহলে সেই শয়তানই উনিশ বছর আমাদের পথে পথে ঘুরিয়েছে? দীর্ঘ উনিশ বছরে যৌবনটা চলে গেছে রাণী, বার্দ্ধক্য আমায় গ্রাস করেছে। মন্দাকিনী—মন্দাকিনী, কোথায় সে শয়তান? আমি তার চোখ দুটো উপড়ে নেব।

মন্দাকিনী। তার সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমাকে ভগ্নীর অধিকার দিয়ে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। তারই অনুগ্রহে আমার হারানো মাণিক ফিরে পেয়েছি।

ভবানন্দ। এঁ্যা—ফিরে পেয়েছ?

মন্দাকিনী। হ্যাঁ প্রভু! এই যে, তার অন্নপ্রাশনে তোমার যৌতুক দেওয়া হীরের কবচ। [কবচ দেখাইল]

ভবানন্দ। এ যে আমারই সাধের কবচ, অন্নপ্রাশনে ছেলেকে যৌতুক দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলুম। কই, কোথায় আমার হারানো মাণিক? কোথায় আমার বংশধর? বল, বল মন্দাকিনী?

মন্দাকিনী। রাজা মুকুটসিংহের ভাই জঙ্গল ঘেরাও করেছে। তাই খোকা ডাকাত সর্দ্দারের সঙ্গে যুদ্ধে গেছে।

ভবানন্দ। খোকা যুদ্ধে গেছে! মন্দাকিনী—মন্দাকিনী, করেছ কি? আমার একমাত্র বংশধরকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে দিলে?

মন্দাকিনী। স্নেহের আকর্ষণ তাকে ঘরে রাখতে পারে নি। দুরন্ত ছেলেটা জোর করে চলে গেল, যুদ্ধের নামে মাতোয়ারা হয়ে।

ভবানন্দ। না—না। আমি তাকে যুদ্ধে যেতে দেব না। চল—চল মন্দাকিনী! আমার হারনো রতনকে বুকে তুলে নিয়ে আসব, বুকে তুলে নিয়ে আসব।

[মন্দাকিনীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

—:০:—

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্য পার্শ্বস্থ ময়দান।

[তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল, মধ্যে মধ্যে কামান গর্জ্জন ও রণকোলাহল শোনা যাইতেছিল।]

দ্রুতপদে ফৈজুদ্দিনের প্রবেশ।

ফৈজুদ্দিন। পাশা উল্টে গেছে—পাশা উল্টে গেছে। তীর চালিয়ে আর দুশমনদের কাবু করা যাবে না। মাঠের একধারে গর্ত্ত খুঁড়ে রেখেছি, সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সকলে এক-সঙ্গে তীর ছোঁড়।

বর্শায় ভর দিয়া টলিতে টলিতে রক্তাক্ত কলেবরে আব্বাসউদ্দিনের প্রবেশ।

আব্বাসউদ্দিন। বাপজান—বাপজান! বিদায় দে বাপজান! আমার যাবার ডাক এসেছে।

ফৈজুদ্দিন। এ কি, আব্বাস? আব্বাস—আব্বাস! বাপ আমার!

আব্বাসউদ্দিন। বেহেস্তে চলেছি বাপজান! দুশমনের সঙ্গে লড়াই করে বীরের ব্যাটা বীর আব্বাস বেহেস্তে চলেছে।

ফৈজুদ্দিন। কোথায় কখন—তোর-এ দুর্দশা হল আব্বাস?

আব্বাসউদ্দিন। খানিকটা আগে। গাছে চড়ে ডাকাত ভায়েরা তীর ছুঁড়ছিল, আর আমি তাদের তীর জুগিয়ে দিচ্ছিলুম। হঠাৎ কামানের গোলায় জঙ্গলের খানিকটা উড়ে গেল। বহুৎ লোক খুন হলো, বহুৎ ভাই গোলার মুখে উড়ে গেল। আর আমি জখম হয়ে বর্শায় ভর দিয়ে তোর সাথে শেষ দেখা করতে এলুম বাপজান!

ফৈজুদ্দিন। শেষ দেখা? শেষ দেখা? ওঃ! আব্বাস, গৌরবের ব্যাটা আমার। বুড়ো বাপের বুকে বাজের ঘা দিয়ে—না—না, খোদার সঙ্গে লড়াই করে তোকে আমি বাঁচিয়ে তুলব আব্বাস!

আব্বাসউদ্দিন। এ সময় ক্ষেপে গিয়ে সময় নষ্ট করিস নি বাপজান! তোর ব্যাটা আব্বাস দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে, কিন্তু আরও জোয়ান ভাই আছে, তারা তোর ব্যাটার সামিল। তাদের নিয়ে লড়াই কর বাপজান, এখনো জেতার আশা আছে।

ফৈজুদ্দিন। আশা আছে—আশা আছে? হ্যা—হ্যা, এখনো আশা আছে। [সহসা চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল] আব্বাস! বাপজান! যা—যা, বর্শায় ভর দিয়ে ওই গর্তের ভেতর গিয়ে ডাকাত ভাইদের তীর চালাতে হুকুম দে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

আব্বাসউদ্দিন। বাপজান!

ফৈজুদ্দিন। যা ব্যাটা, যা ওই গর্তের ধারে। ফিরে আসবার আগেই যদি শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িস, পড়ে থাকিস ওই গর্তের ধারে, আমি মহাসমারোহে তোর কবর দেব! কিন্তু তার আগে রাজশক্তিকে এমন শিক্ষা দিয়ে যাব, যার জ্বালায় অস্থির হয়ে প্রজাদের দাবী মিটিয়ে দিতে বাধ্য হবে।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে—জয় জনশক্তির জয়—জয় জনশক্তির জয়।]

আব্বাসউদ্দিন। তাই কর বাপজান—তাই কর! তোর সে কাজ মাটির মায়ের বুকে দাঁড়িয়ে আর হয়ত দেখবার অবসর পাব না। কিন্তু শূন্যে আমার আত্মাটা ঘুরে ঘুরে দেখবে আর আনন্দে করতালি দেবে। [টলিতে টলিতে প্রস্থানোদ্যোগ]

ভানুসিংহের প্রবেশ।

ভানুসিংহ। সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হোক দস্যু। [আক্রমণ]

আব্বাসউদ্দিন। [অস্ত্রের দ্বারা বাধা দিয়া] ওঃ! বাপজান! হল না—হল না। তোর হুকুম তামিল করা হল না। [উভয়ের যুদ্ধ, দুর্ব্বলতাবশতঃ আব্বাসের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল, ভানুসিংহ তাহাকে হত্যা করিতে অস্ত্র তুলিল] মেরো না, আর একবার যুদ্ধ করবার সুযোগ দাও।

ভানুসিংহ। সে সুযোগ আর এ জীবনে পাবে না ছোটলোক ডাকাত, সে সুযোগ নিবি একেবারে যমের বাড়ী গিয়ে।

অচিন্ত্যার প্রবেশ।

অচিন্ত্য। তার আগে তোমাকেই সে পথে যেতে হবে রাজ-পুরুষ! [ভানুসিংহের অস্ত্রে প্রতিঘাত দিল]

ভানুসিংহ। এ কি! কে তুমি? তোমায় যে বড় পরিচিত মনে হচ্ছে।

অচিন্ত্য। আজকের পরিচয় শুধু অস্ত্রের প্রতিযোগিতায়। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর বীর।

ভানুসিংহ। চিনেছি—চিনেছি। একদিন ডাকাতের কবল থেকে তুমিই আমার প্রাণরক্ষা করেছিলে?

অচিন্ত্য। যা রক্ষা করেছি, আজ তা ফিরিয়ে নিয়ে যাব। যুদ্ধ কর রাজপুরুষ! আর কোন কথা নয়, শুধু যুদ্ধ। [আক্রমণ ও উভয়ের যুদ্ধ]

ভানুসিংহ। এখনো যুদ্ধ বন্ধ কর—এখনো যুদ্ধ বন্ধ কর!

অচিন্ত্য। না—না, যুদ্ধ বন্ধ হবে না, যুদ্ধ বন্ধ হবে না। যতদিন তোমাদের আভিজাত্য মাথা উঁচু করে থাকবে, ততদিন চলবে এ যুদ্ধ।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

আব্বাসউদ্দিন। ওঃ! খোদা—খোদা! হারানো শক্তি আর একবার ফিরিয়ে দাও মেহেরবান। আমি শেষ চেষ্টা করে দেখব জনশক্তির গলায় জয়মালা পরাতে পারি কিনা।

সিদ্ধেশ্বর ও কৈলাসের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। আর তা হবে না আব্বাস! রাজশক্তি চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে।

কৈলাস। আব্বাসভাই! আমাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করতে আজ তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছ?

আব্বাসউদ্দিন। একদিন সবাইকে যেতে হবে কৈলাস! দুঃখ সেজন্য নয়। দুঃখ এই যে কাজের জন্য আমার ডাকাত হলুম তার শেষ দেখে যেতে পারলাম না।

সিদ্ধেশ্বর। পারবে আব্বাস, দেখে যেতে পারবে। তোমার বাপজান বলেছিল বন্দী মুকুটসিংহকে শেষ করে দিতে। পথের মাঝে দেখা করে আমি বলে এসেছি, বন্দী অবস্থায় তাকে রণক্ষেত্রে নিয়ে আসতে।

আব্বাসউদ্দিন। কি লাভ তাতে?

সিদ্ধেশ্বর। সহজে কার্য্য উদ্ধার হবে। মহারাণী সৈন্যদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কচ্ছেন, সেইখানেই সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে। কৈলাস, আব্বাসকে নিয়ে যা।

কৈলাস। দেওয়ানবাবু!

সিদ্ধেশ্বর। দেরী করিস নি, চট করে চলে আয়!

[কৈলাস ও আব্বাসউদ্দিন সহ প্রস্থান।

যুদ্ধরত ভানুসিংহ ও অচিন্ত্যার পুনঃ প্রবেশ। উভয়ের দেহ ক্ষত-বিক্ষত ও সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত।

অচিন্ত্য। এখনো যুদ্ধ বন্ধ কর রাজপুরুষ, নইলে তোমাকেও ওই পথে যেতে হবে।

ভানুসিংহ। ক্ষত্রিয় সন্তান মরতে ভয় পায় না যুবক! ডাকাতদের উচ্ছেদ করে প্রজাদের বুঝিয়ে দেব, পদ্মনগরের রাজশক্তি এখনো দুর্ব্বল হয় নি!

[উভয়ের যুদ্ধ ও সহসা ভানুসিংহের তরবারি হস্তচ্যুত হইল।]

অচিন্ত্য। এইবার মৃত্যুর দেশে যাও রাজপুরুষ! [ভানুসিংহের হত্যায় অস্ত্র তুলিল]

অস্ত্র হাতে সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদামিনী। তার আগেই মৃত্যুর দেশে যা শিশু শয়তান। [অস্ত্র তুলিল]

সাধনা। [নেপথ্যে] অস্ত্র নামাও মা—অস্ত্র নামাও।

[সৌদামিনী কর্ণপাত করিল না, অচিন্ত্যর কাঁধে অস্ত্রাঘাত করিল।]

অচিন্ত্য। ওঃ! জননী জন্মভূমি! [আর্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল]

সাধনার প্রবেশ।

সাধনা। এ কি করলে মা—এ কি করলে?

অচিন্ত্য। এ কি, সাধনা? সা-ধ-না?

সাধনা। তোমার এ দশা দেখতে হবে এ যে কল্পনাও করিনি প্রিয়তম!

সৌদামিনী। কালামুখি! আভিজাত্য গৌরবে পদাঘাত করে ছোটলোক ডাকাতের ছেলেকে—

সাধনা। সাবধান মা! এই যুবক ছোটলোক নয়, ছোট তোমরা, অকৃতজ্ঞ, বেইমান তোমরা, তাই দেবতার মত মহান যুবকের দেহে পেছন থেকে অস্ত্রাঘাত করেছ।

ভানুসিংহ। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। পদ্মনগরের রাজকন্যা তুই, এত হীন প্রবৃত্তি তোর? আভিজাত্যহীন পথের ছেলে ডাকাত দলে যোগ দিয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল, আর তুই তাকে আত্মদান করতে পারলি না বলে মাকে তিরস্কার করছিস? আমরা ছোট? আমরা অকৃতজ্ঞ? আমরা বেইমান?

সৌদামিনী। না—না। কলঙ্কিনীকে ক্ষমা করো না ভানু। যে মুখে ও আমাদের ছোট বলেছে, ওর সেই মুখটা ভেঙে দাও।

[বামহস্তে কানাইয়ের হাত ধরিয়া ও বন্দী মুকুটসিংহকে অস্ত্রের ইঙ্গিতে চালাইয়া কৈজুদ্দিনের পুনঃ প্রবেশ।]

কৈজুদ্দিন। তাই দাও রাণী, তাই দাও। আর আমিও তলোয়ারের চোটে তোমার স্বামীকে শেষ করে দিই।

অচিন্ত্য। সর্দার? স-র্দা-র—[মৃত্যু]

কৈজুদ্দিন। চ'লে গেলি বাপ! যা-যা, ধনীর দুনিয়া থেকে চলে যা তুই, বেহেস্তে গিয়ে খোদার কাছে মনের ব্যথা জানাস, আমিও যাচ্ছি তোর পেছনে।

কানাইসিংহ। মা—মা, এরা আমায় এতদিন আদর যত্ন করেছে, আজ বলছে যদি তোর মা আমাদের দাবী মিটিয়ে না দেয় তাহলে তোকেও হত্যা করব।

মুকুটসিংহ। শুধু তোকে নয় কানাই, আমাকেও হত্যা করে ওদের জেদ বজায় করবে।

কৈজুদ্দিন। তা ত করবই! আমার জোয়ান ব্যাটা কবরের পথে চলেছে, আর আমি তোদের মেঠাই-মোণ্ডা খাওয়াব? বেছে নাও—বেছে নাও রাণী, কোনটা তোমার চাই! বিধবা হয়ে একমাত্র ব্যাটার মৃত্যু শোক—না প্রজাদের দাবী মেনে নিয়ে সংসারকে ফলে ফুলে সাজিয়ে তুলবে?

সৌদামিনী। ভানুসিংহ! ভানুসিংহ! বল ত এখন আমি কি করব? একদিকে পতিপুত্রের জীবন, অন্যদিকে শ্বশুরবংশের আভিজাত্য। বল রাজপুত্র! কোনটা রক্ষা করা আমার কর্তব্য?

ভানুসিংহ। [আপনমনে] আভিজাত্য গৌরব—আভিজাত্য গৌরব! কিন্তু একমাত্র রাজবংশধর, আর আমার স্নেহপরায়ন দাদা! এদের চিরবিদায়—না—না, এ অসম্ভব!

সাধনা। কেন কাকা? প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথা বুঝি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছ?

কৈজুদ্দিন। না—না, এখনো বোঝেন নি, তবে এখুনি যদি মীমাংসা হয়, তাহলে—

মুকুটসিংহ। আমাকে হত্যা করবে? তাই কর সর্দ্দার,—তাই কর। তোমাদের বন্দী হয়ে এ নরক যন্ত্রণা আর আমি সইতে পাচ্ছি না।

কানাইসিংহ। মা—মা, সত্যই কি আমায় মরতে হবে?

ফৈজুদ্দিন। উত্তর দাও রাণী, ভেবে উত্তর দাও।

সৌদামিনী। ভানুসিংহ!

কানাইসিংহ। মা! মা! বাবাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচতে দাও।

সৌদামিনী। ওঃ! আর পাচ্ছি না, আর পাচ্ছি না। দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সব দৃঢ়তা ভেসে যাচ্ছে। ডাকাতসর্দ্দার—ডাকাতসর্দ্দার!

মুকুটসিংহ। রাজ আভিজাত্য ধূলোয় মিশে যাবে রাণী!

সৌদামিনী। যাক, ধূলোয় মিশে যাক আভিজাত্য গৌরব! তবু আমার স্বামী পুত্রের জীবনের মূল্য—

সাধনা। অনেক বেশী, না পাষাণী? মা হয়ে পরের ছেলেকে অস্ত্রাঘাত করে পৃথিবী থেকে বিদায় দিচ্ছ—

দ্রুতপদে ভবানন্দ ও মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দাকিনী। কাকে বিদায় দিচ্ছ মা? গোপনে অস্ত্রাঘাত করে কাকে বিদায় দিচ্ছ?

ফৈজুদ্দিন। তোর ছেলেকে মা—তোর ছেলেকে। ওই দেখ—ওই দেখ, রাক্ষসীরাণী পেছন থেকে তলোয়ারের চোট মেরে কাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে।

মন্দাকিনী। খোকা—খোকা! ওরে হারানো মাণিক, মিলনের শুভলগ্নে অভাগিনী মাকে ছেড়ে কোথায় চলেছিস? [বক্ষে পড়িল]

ভবানন্দ। ওঃ! আর সইতে পাচ্ছি না—আর সইতে পাচ্ছি না মন্দাকিনী! রাজশক্তি আমায় সর্ব্বহারা করেছে, আজ আবার পুত্রহারা করলে! না—না, আমি ওদের ক্ষমা করব না—ক্ষমা করব না। [ভানুসিংহ ও সৌদামিনীর দিকে অগ্রসর]

দ্রুতপদে সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ ও বাধা দান।

সিদ্ধেশ্বর। কি করছেন—কি করছেন বাবু? ওরা চলে গেলে যে দেশের আশা পূর্ণ হবে না।

ভবানন্দ। কে—কে? দেওয়ান সিদ্ধেশ্বর?

সিদ্ধেশ্বর। হ্যাঁ বাবু! আপনার পুরাতন ভৃত্য সিদ্ধেশ্বর।

মুকুটসিংহ। সিদ্ধেশ্বর—সিদ্ধেশ্বর! এই উন্মাদই তাহলে ভবানন্দ পাল?

ভবানন্দ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমাদের কালরাহু। বল—বল রাণী, কেন এই দুধের ছেলেকে হত্যা করেছ?

ফৈজুদ্দিন। তার কৈফিয়ৎ এখানে নয়,—দিতে হবে ওই ওপর-ওয়ালার কাছে। এখন ঠাণ্ডা হও বাবা, ঠাণ্ডা হও। তোমার ছেলে দেশের নিরন্ন ভাই বোনদের দাবী আদায় করতে গিয়ে রাজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে।

সাধনা। [বক্ষ হইতে উঠিয়া] না—না, ও একা যেতে পারবে না। চল প্রিয়তম! আমিও তোমার সঙ্গে যাব। [ভূপতিত অস্ত্র তুলিয়া লইল]

মুকুটসিংহ। সাধনা—সাধনা!

সাধনা। স্নেহের আকর্ষণ আর আমায় বেঁধে রাখতে পারবে না বাবা, আমি আজ পরপারের যাত্রি। [বক্ষে ছুরিকাঘাত]

মুকুটসিংহ, ভানুসিংহ। } সাধনা—সাধনা—
সৌদামিনী। }

সাধনা। বিদায়—বিদায়—বি-দা-য়—

ভবানন্দ। বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে। এ লোকে এদের মিলন পথে বাধা হয়েছিল তোমাদের আভিজাত্য গৌরব, তাই ওরা অমর লোকে চলেছে মিলনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে।

মুকুটসিংহ। মিলনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে চলেছে চিরশত্রু ভবানন্দের ছেলের সঙ্গে আমার আদরিণী কন্যা। আর আভিজাত্যের খোলস পরে কোন ফল হবে না বাপি। কেবল আঘাতই সইতে হবে।

ফৈজুদ্দিন। তাহলে প্রজাদের দাবী—

মুকুটসিংহ। পূর্ণ করে দিচ্ছি ফৈজুদ্দিন, আগে ভবানন্দের জমিদারী—

ভবানন্দ। জমিদার ভবানন্দ পাল তার জমিদারী দীন দুঃখী প্রজাদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

আব্বাসউদ্দিনকে লইয়া কৈলাসের পুনঃ প্রবেশ।

কৈলাস। প্রজারা মাথা পেতে আপনার দান নেবে বাবু!

ভবানন্দ। একি! কৈলাস?

কৈলাস। হ্যাঁ বাবু! দেওয়ানবাবুদের সঙ্গে কৈলাসও প্রজাদের দাবী আদায় করতে বেঁচে আছে।

আব্বাসউদ্দিন। বাপজান—বাপজান! আজ আমার জান দেওয়া সার্থক হল। আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না,—আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

তুই আমায় একবার বুকে নে বাপজান ! [আবেগভরে কৈজুদ্দিনের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে গিয়া পড়িয়া গেল] ওঃ—

কৈজুদ্দিন। আব্বাস—আব্বাস, বাপজান !

আব্বাসউদ্দিন। ওঃ—খো—দা—বা—প—জা—ন—দে—শ—মা—য়ে—র—পা—য়ে—সে—লা—ম—[মৃত্যু]

কৈজুদ্দিন। আব্বাস—আব্বাস—সব শেষ। রাজা—রাজা, এখনো আব্বাসের আত্মা দেহ ছেড়ে যায় নি। বল—বল, তুমি বল পদ্মনগর পরগণা—

মুকুটসিংহ। আজ থেকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হল। এ রাজ্যে উচ্চ-নীচ থাকবে না, জাতিভেদ থাকবে না, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না, সবাই পাবে সমান অধিকার আর সম মর্য্যাদা। একই জাতীয় পতাকার তলে দাঁড়িয়ে সবাই গাইবে জাতীয় সঙ্গীত, আর সেই হবে জাতির আভিজাত্য গৌরব।

[সকলের প্রস্থান।